আরেক রকম

সপ্তম বর্ষ নবম সংখ্যা

১-১৫ মে ২০১৯   ১৬-৩১ বৈশাখ ১৪২৬

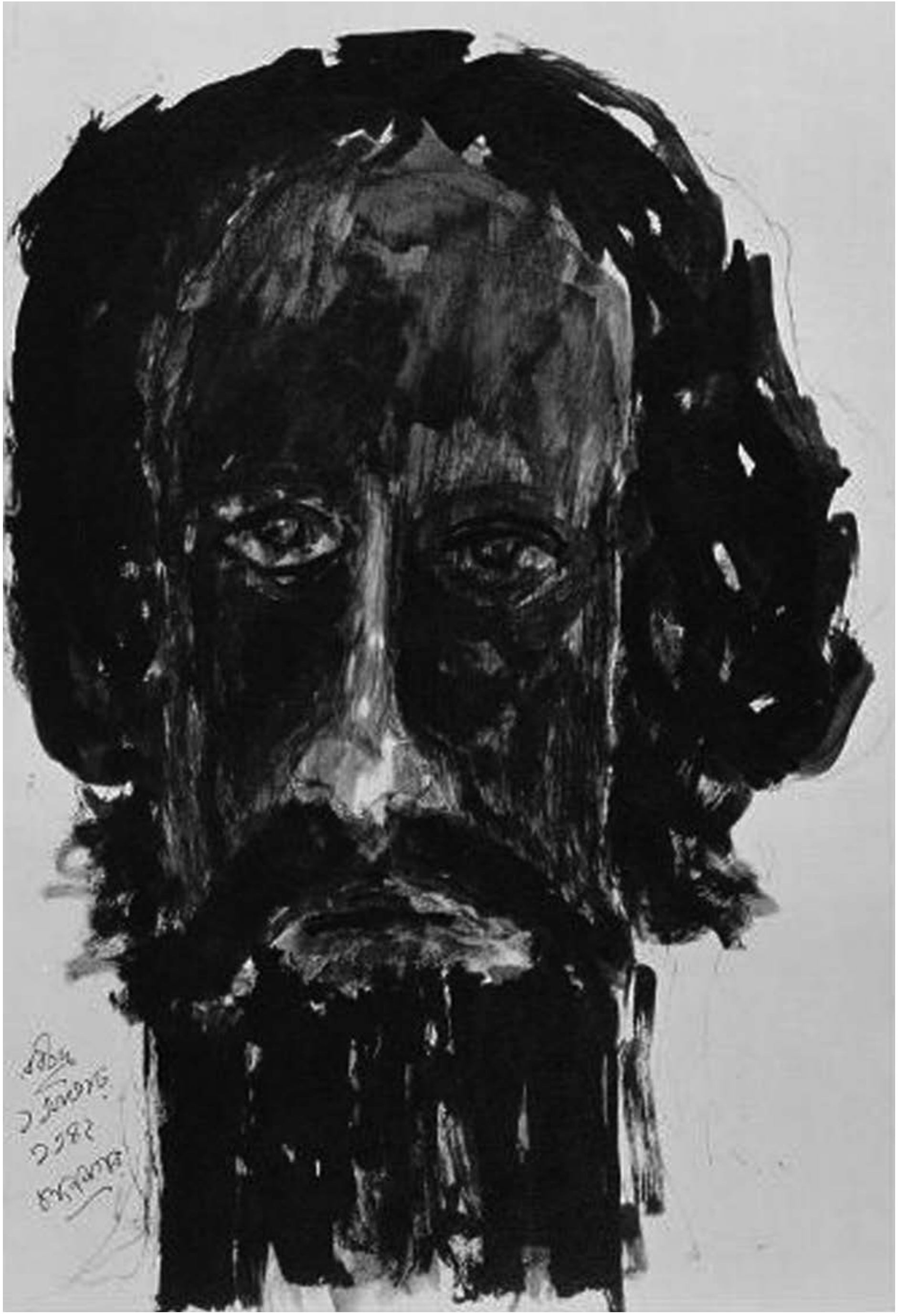

মূল্য : ২০ টাকা

আরেক রকম

পাক্ষিক পত্রিকা, মাসের ১লা ও ১৬ই প্রকাশিত

স্বত্বাধিকারী : সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

সম্পাদক

শুভনীল চৌধুরী

subhanilc@gmail.com

সম্পাদকীয় দপ্তর

আরেক রকম

৩৯এ/১এ বোসপুকুর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪২

প্রতি সংখ্যা ২০ টাকা

বার্ষিক সডাক ৫০০ টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে ‘সমাজ চর্চা ট্রাস্ট’-এর সদস্য হলে তাঁকে *আরেক রকম*-এর স্থায়ী গ্রাহক করে নেওয়া হবে।

arekrakam@gmail.com
samajcharcha@gmail.com

স্বত্বাধিকারী

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

কমার্শিয়াল কমপ্লেকস (চতুর্থ তল)

৮১/২/৭ ফিয়ার্স লেন

কলকাতা ৭০০ ০১২

গ্রাহক পরিষেবা

রবিন মজুমদার

৯৪৩২২১৯৪৪৬

আরেক রকম

সপ্তম বর্ষ নবম সংখ্যা ১-১৫ মে ২০১৯,
১৬-৩১ বৈশাখ ১৪২৬
Vol. 7, Issue 9th, Arek Rakam RNI No. WBBEN/2013/49896

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: অশোক মিত্র

উপদেষ্টা: অমিয়কুমার বাগচী

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী
গৌরী চট্টোপাধ্যায়
কালীকৃষ্ণ গুহ
প্রণব বিশ্বাস
ইমানুল হক
শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ
নামলিপি: হিরণ মিত্র
প্রচ্ছদ ছবি: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ফোন: ০৩৩-৪০৬৪-৪০৯৭, ৪১০৩, ৬৩৫৩

বাংলাদেশ পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

আরেক রকম পত্রিকার জন্য যোগাযোগ স্থল
শিলিগুড়ি: নন্দদুলাল দেবনাথ, ৯৪৭৪৩৮৩৪৪২
বোলপুর: সোমনাথ সমাদ্দার, ৯৪৭৫৩৬৩৩৫২

ওয়েব সাইট: www.arekrakam.com

প্রতি সংখ্যা কুড়ি টাকা

বার্ষিক সডাক পাঁচশো টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে *আরেক রকম* আজীবন বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

সূ ◆ চি ◆ প ◆ ত্র

সম্পাদকীয়

আরেক রকম অশোক মিত্র ৫

A থেকে Z সবই নাকি হয়ে গেছে ৭

সমসাময়িক

জুলিয়ান আসাঞ্জ এক বিপজ্জনক সন্ত্রাসবাদীর নাম ১০

নির্বাচন কমিশন? মোদী কমিশন? ১২

স্বপ্ন ও সত্য ১৩

অশোক মিত্র ও *আরেক রকম*
সুজিত পোদ্দার ১৫

সংখ্যালঘুর আকুতি
শেখর দাশ ২০

গুটিয়ে গেল জেট-এর ডানা
অমিতাভ রায় ২৩

'নমো-বুলি' বনাম 'মনের কথা'
শ্রীদীপ ২৫

প্রতারণার জবাব দিতেই হবে
বরুণ কর ২৭

উচ্চশিক্ষার সমুচ্চ তা-লে-বে-তা-লে
সুমন ভট্টাচার্য ২৯

দেশপ্রেমিক নন্দলাল
অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ী ৩৪

বিজ্ঞান বনাম বিজ্ঞানী
মানস প্রতিম দাস ৩৮

সাংবাদিক কার্ল মার্কস
সুরেশ কুণ্ডু ৪২

এক মহাজীবন ও একটি 'অন্য' সকাল
অমূল্যকুমার ভট্টাচার্য ৪৪

গীতা মুখার্জি: অতি বিরল রাজনীতিক
গৌতম রায় ৪৯

চিঠির বাক্সো ৫২

পুনঃপাঠ

আমার মৃত্যুর পর
অশোক মিত্র ৫৬

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট-এর পক্ষে তৃষিতানন্দ রায় কর্তৃক ৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪২ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক এস. পি. কমিউনিকেশনস্ প্রা. লি., ৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

ছবি : স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়

আরেক রকম

সম্পাদকীয়

আরেক রকম অশোক মিত্র

আজ একবছর হল অশোক মিত্র আমাদের মধ্যে নেই। পশ্চিমবঙ্গের বাম মননের সর্বাধিক ধারালো, অকুতোভয়, স্পষ্টবাদী, সত্যের প্রতি দায়বদ্ধ কলম থেমে গেছে। কিন্তু তাঁর নিষ্ঠায় সৃষ্ট *আরেক রকম* তাঁর মতাদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে বিগত একবছর ধরে, তাঁর অনুপস্থিতিতেও, নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। যেই গুরুদায়িত্ব তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন তা পালন করতে আমরা দায়বদ্ধ। পত্রিকার মান কতখানি ধরে রাখা গেছে, বিষয়ের বৈচিত্র্যে ও প্রাসঙ্গিকতায় আমরা কতটা *আরেক রকম* হতে পেরেছি, তার বিচার পাঠক করবেন। কিন্তু আমরা অশোক মিত্রের দেখানো পথে দেশের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি *আরেক রকম*-এর পাতায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

অশোক মিত্র মার্কসবাদ তথা বামপন্থার যে পথে বিচরণ করেছেন, তাও *আরেক রকম* ছিল। এই প্রেক্ষিতে তিনটি বিষয়ের এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। আমরা সবাই জানি যে অশোক মিত্র প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। বামফ্রন্ট সরকার তার কার্যকালের প্রথম দশ বছরে দুটি যুগান্তকারী কার্যক্রম পশ্চিমবঙ্গে রূপায়িত করে— ভূমি সংস্কার এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। ভূমি সংস্কার বামপন্থীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। গোটা তৃতীয় বিশ্বে ভূমি সংস্কারের জন্য বামপন্থীরা আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত করেন, শ্রমিক-কৃষক ঐক্য গড়ে তুলে বাম আন্দোলনকে শক্তিশালী করার তত্ত্ব লেনিন, মাওয়ের মতো নেতা ও তাত্ত্বিকের লেখায় পাওয়া যায়। কিন্তু ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে তৃণমূল স্তরে মানুষের ক্ষমতায়ন করার তত্ত্ব মার্কসবাদের ক্লাসিক সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আমাদের দেশে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কল্পনা গান্ধীর চিন্তায় উল্লেখযোগ্যভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু মার্কসীয় তত্ত্বে আমাদের শেখানো হয়েছিল কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থব্যবস্থাকে গড়ে তোলার কাহিনি। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ তথা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সরাসরি এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

কিন্তু অশোক মিত্র ও তাঁর সহযোগী নেতা তথা তাত্ত্বিকরা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন যে গণতান্ত্রিক

ব্যবস্থায় ভারতের মতন একটি জাতপাত প্রথায় বিধ্বস্ত দেশে গরিব মানুষ তথা নিম্নবর্গীয়দের গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতায়ন করাই একটি বিপ্লবী প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে 'যুগ যুগ লাঞ্ছিত' মানুষ প্রথম বার তাঁদের গ্রামে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে গ্রামীণ সমাজের পশ্চাদ্পদ রক্ষণশীল ক্ষমতার কেন্দ্রে তীব্র আঘাত হানবে। ভূমি সংস্কার এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থব্যবস্থা কয়েক দশকের স্থিতাবস্থা ও জড়তা কাটিয়ে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মুখ দেখে। আজকের সরকারের কাজের বয়ান দিতে গিয়ে অনেক বুদ্ধিজীবীই বলে থাকেন যে পশ্চিমবঙ্গে নাকি তৃণমূল কংগ্রেস উন্নয়নের জোয়ার এনে দিয়েছে। কিন্তু অশোক মিত্র তথা তাঁর কমরেডরা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থব্যবস্থায় যে পরিবর্তন সাধিত করেছিলেন, তার তুলনীয় কোনো কিছু তৃণমূল সরকার তো দূরস্থান পরবর্তী বামফ্রন্ট সরকারগুলিও করতে পারেনি। এই ঐতিহাসিক পরিবর্তন সাধনের গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ও সৈনিক ছিলেন অশোক মিত্র। পুঁথিগত মার্কসবাদে সীমাবদ্ধ না থেকে সৃজনশীল প্রয়োগের এক অসাধারণ উদাহরণ হিসেবে ভারতে বামপন্থার ইতিহাসে রয়ে যাবে তাঁদের সৃষ্ট নীতি।

দ্বিতীয় যেই কাজের জন্য অশোক মিত্র অর্থনীতিবিদ ও অর্থমন্ত্রী হিসেবে চিরস্মরণীয় তা হল কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসকে কেন্দ্র করে বাম দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ এবং অন্যান্য সহযোগী রাজনৈতিক দলগুলিকে এই বিষয়ে একই ছাতার তলায় নিয়ে আসা। অবশ্যই রাজনৈতিকভাবে জ্যোতি বসু এই আন্দোলনের মুখ্য নেতা ছিলেন। কিন্তু তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করেছিলেন অশোক মিত্র। কেন্দ্রের হাতে ক্ষমতা ঘনীভূত থাকলে তারা তা ব্যবহার করবে নিজেদের পুঁজিবাদী পৃষ্ঠপোষকদের সুবিধার্থে। রাজনৈতিকভাবে তারা সেই ক্ষমতাকে বিরোধী দলের রাজ্য সরকারগুলির বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। রাজ্য সরকারগুলিকে বাধ্য করবে কেন্দ্রের পছন্দের নীতিসমূহকে লাগু করতে, নয়তো তারা আর্থিক সাহায্য দেবে না। তা যদি হয়, তবে ভারতের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে, বিবিধ প্রকারের রাজনৈতিক মতাদর্শভিত্তিক দল তথা সরকারের সুতো বাঁধা থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। তারা যেমন নাচাবে, রাজ্য সরকারগুলিকে তেমনভাবেই নাচতে হবে। ১৯৮০-র দশকেই অশোক মিত্র বুঝতে পেরেছিলেন যে এই প্রবণতাকে চ্যালেঞ্জ না করা হলে, এই প্রবণতার বিরুদ্ধে সোচ্চার না হলে বামফ্রন্ট সরকার বা অন্যান্য সরকারগুলিকে কেন্দ্র আর্থিকভাবে মেরে ফেলতে পারে। রাজ্যগুলির হাতে উন্নয়নমূলক কাজের সিংহভাগ খরচের ভার। কিন্তু করের সিংহভাগ কেন্দ্রের হাতে। যদিও অর্থ কমিশন কেন্দ্রীয় করের ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের মর্জি কমিশনের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে। তাই রাজ্যগুলিকে নিজেদের নীতিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হলে অধিক আর্থিক ক্ষমতার জন্য সোচ্চার হতেই হবে।

এই তাত্ত্বিক কাঠামোর উপরে ভিত্তি করে যে ঐতিহাসিক কার্যক্রম জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে শুরু হয় তা ইন্দিরা গান্ধীর আকস্মিক হত্যা না হলে বামপন্থীদের গোটা দেশে আরো সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করত বলে অশোক মিত্র মনে করতেন। কিন্তু আবারও বলতেই হয়, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের সপক্ষে মার্কসীয় সাহিত্যে খুব বেশি তত্ত্ব পাওয়া যাবে না। এই ক্ষেত্রেও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথাই অশোক মিত্ররা বলছিলেন। কিন্তু মার্কসীয় সমাজবাদী অর্থব্যবস্থায় এহেন বিকেন্দ্রীকরণ তাত্ত্বিকভাবে প্রোথিত নয়। এই ক্ষেত্রেও অশোক মিত্র মার্কসবাদীদের মধ্যে *আরেক রকম* চিন্তার কাণ্ডারি ছিলেন।

আজকের দিনে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের প্রশ্নে বামপন্থীরাও তাদের অবস্থানকে লঘু করেছেন। জিএসটি-র মতন একটি জনবিরোধী এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোবিরোধী কর ব্যবস্থা দেশে লাগু হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকারগুলির পণ্যের বেচা-কেনার উপরে কর আরোপ করার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বামপন্থীরা এই আইনকে সমর্থন জানিয়েছেন, কেরলের বাম সরকারও এই আইনকে মেনে নিয়েছে এবং এই আইনের খসড়া তৈরির ক্ষেত্রে এই রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন। আজ প্রমাণিত হয়েছে যে জিএসটি মানুষের কোনো উপকারে আসেনি, রাজ্য সরকারগুলিরও কোনো লাভ হয়নি। জীবনের প্রায় শেষ দিন অবধি অশোক মিত্র চেয়েছিলেন যে এই বিষয়ে প্রতিবাদ হোক, এমনকী সুপ্রিম কোর্টে মামলা রুজু করার চেষ্টাও করেছিলেন। কেন্দ্রের লেঠেলগিরির বিরুদ্ধে এবং রাজ্য সরকারগুলির অধিকারের পক্ষে সদা সোচ্চার ছিলেন তিনি।

ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের বিরুদ্ধে অশোক মিত্রের সোচ্চার অবস্থান শুধুমাত্র পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বা কেন্দ্র-রাজ্য

সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নামে পার্টির মধ্যে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন তিনি। বহু বার বলেছেন যে সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার মধ্যে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা গণতন্ত্রের ক্ষতি করে। সেই ক্ষমতাই যখন আবার বাম সরকার কৃষকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে তখন অশোক মিত্রের কলম তাঁর প্রিয় বামফ্রন্ট সরকারকে রেয়াত করেনি। আক্ষেপ করেছেন, বলেছেন, 'তুমি আর নেই সে তুমি', অনুরোধ করেছেন বামপন্থীদের তাদের শিকড়ে ফিরতে, শুরু থেকে শুরু করতে, ক্ষিপ্ত হয়েছেন তাদের স্খলনে। কিন্তু তাই বলে 'তৃণজীবী' হননি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় নিজের বিবেক বিকিয়ে দেননি। শেষদিন অবধি স্বৈরাচারী, দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূলের বিরুদ্ধে লিখে গেছেন, ২০১৬ সালের নির্বাচনে 'হামাগুড়ি দিয়ে' হলেও মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। এমনকী বামপন্থীদের সঙ্গে দলিত ও আদিবাসী আন্দোলনের মেলবন্ধনের পক্ষে সওয়াল করেছেন তিনি। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে একদিকে যেমন পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীদের স্খলন তাঁকে পীড়া দিয়েছে, অন্যদিকে তিনি বামপন্থার প্রতি কোনোদিন এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাসঘাতকতা করেননি।

অশোক মিত্র তাঁর পত্রিকার নামকরণ *আরেক রকম* কেন রাখলেন? তিনি চেয়েছিলেন *আরেক রকম*-এর পরিসরে গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে ভিন্ন স্বাদের আলোচনা হবে যার শিকড় থাকবে বামপন্থায়। কিন্তু শুধু তাই বোধহয় নয়। অশোক মিত্রের চিন্তার ধারা বরাবরই *আরেক রকম* খাতে রয়েছে। মার্কসবাদের কেঠো পুনরুচ্চারণ নয়, তিনি চেয়েছিলেন এবং করেছিলেন তার সৃজনশীল প্রয়োগ, যার সাক্ষ্যবহন করছে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের মতন কর্মসূচি। একইসঙ্গে অসাধারণ সত্যবাদিতার পরিচয় দিয়ে তিনি বামপন্থীদের ভুল নীতির বিরুদ্ধে কলম ধরতেও দ্বিধা করেননি।

তাঁর প্রয়াণের পরে *আরেক রকম* এই ধারাকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বামপন্থার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রেখেও, *আরেক রকম*, একুশ শতকের বাস্তবতার কথা মাথায় রেখে মার্কসবাদের সৃজনশীল প্রয়োগের চিন্তার মাধ্যম হয়ে উঠবে। দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন বাম চিন্তার মাধ্যম হয়ে ওঠার প্রয়াস করব আমরা। সর্বোপরি বামপন্থার যেকোনো বিচ্যুতির বিরুদ্ধে *আরেক রকম* সদা জাগ্রত থাকবে। এই লক্ষ্যের প্রতি দায়বদ্ধ থাকাই অশোক মিত্রের স্মৃতির প্রতি *আরেক রকম* শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

A থেকে Z সবই নাকি হয়ে গেছে

দেশের চৌকিদার প্রচার-হুংকার, মন কি বাত ইত্যাদিতে সদাব্যস্ত। তাঁর উচ্চারিত শব্দসমষ্টি থেকে বোঝা যাচ্ছে A থেকে Z সবই হয়ে গেছে। কীরকম? দেখা যাক।

A আয়ুষ্মান ভারত। এই প্রকল্পের ফলে গরিব মানুষের থেকে বেশি উচ্ছ্বসিত কর্পোরেট হাসপাতালগুলি। বাস্তবে কিন্তু A মানে এয়ারপোর্ট দুর্নীতি। পাঁচটি বিমানবন্দরের পরিচালনার দায়িত্ব আদানি গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিমানবন্দরের পরিচালনার বিষয়ে আদানি গোষ্ঠীর কোনো অভিজ্ঞতা আছে কি?

B বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও। দেশের মেয়েদের নিরাপত্তার হাল-হকিকত দেখলেই এই প্রকল্পের অবস্থা বোঝা যায়। প্রকল্পের ৫৬ শতাংশ বরাদ্দ খরচ হয়েছে বিজ্ঞাপনের কাজে আর মাত্র ২৪ শতাংশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যগুলিকে। B বলতে নাকি বুলেট ট্রেনও বোঝায়। তবে সেই রেলগাড়ি কবে চলবে আর কারা তা চড়বে কেউ জানে না।

C মানে 'কোরাপশন ফ্রি ইন্ডিয়া' বা দুর্নীতিমুক্ত ভারতের কথা বলা হচ্ছে। চৌকিদারের চোখের সামনে, অনেকের মতে তাঁর সহায়তায়, দুর্নীতি যে কীভাবে সমাজের সব স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে তা নতুন করে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। ৩০ জনের বেশি চোর ব্যবসায়ী চৌকিদারের নাকের ডগার সামনে দিয়ে বিদেশ পালিয়েছে, রাফালের দুর্নীতি প্রমাণ করছে যে মোদী চোরেদের চৌকিদার।

D অর্থাৎ ডিমনিটাইজেশন বা চলতি ভাষ্যে নোটবন্দি যা অসংগঠিত ক্ষেত্রকে ধ্বংস করেছে। দেশের বেশিরভাগ মানুষই নোটবন্দির ভুক্তভোগী। D বলতে তিনি আবার কথায় কথায় ডিজিটাল ভারতের কথা বলেন। ডিজিটাল ব্যবস্থার তিক্ত অভিজ্ঞতায় ভারতবাসী আজ সম্পৃক্ত।

E বলতে ইলেকট্রিফিকেশন, ই-টেন্ডার ইত্যাদির কথা বলা হচ্ছে। তিনি চৌকিদারের কাজ শুরু করার আগেই দেশের প্রায় প্রতিটি প্রান্তে বিদ্যুৎ পৌঁছেছিল। সামান্য যেটুকু বাকি ছিল তা সাম্প্রতিক অতীতে আপন গতিতে হয়ে গেছে। এর মধ্যে তাঁর কৃতিত্ব কোথায়? বরং প্রশ্ন তোলা যায় তাঁর আমলে নতুন ক-টা বিদ্যুৎ প্রকল্প কাজ শুরু করেছে? উত্তর নেই। এমনকী ইতিমধ্যেই সংস্থাপিত বিদ্যুৎকেন্দ্র চাহিদার অভাবে চালু করা হয়নি। অর্থাৎ গার্হস্থ্য ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়েনি। আর ই-টেন্ডার সংক্রান্ত গরমিলের যেসব খবর হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে তা সত্যি হলে আগামী দিনে গভীর বিপদ আসন্ন।

F মানে নাকি ফার্মার্স ফসল বিমা। কৃষকের ফসল বিমা নাকি এতই সফল যে ফসলের ন্যায্য দামের দাবিতে কৃষকের আন্দোলন প্রতিদিন সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করছে। ফসল বিমায় কৃষকের কোনো লাভ হয়নি। বরং বিপুল মুনাফা কামিয়েছে বেসরকারি বিমা কোম্পানিগুলি।

G বলতে জিএসটি-র সাফল্যকে তিনি সবসময় উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করেন। বাস্তবে জিএসটি-র হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে প্রতিটি মানুষ উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষারত।

H মানে হাইওয়ে নির্মাণ। দেশের সড়ক ব্যবস্থার বাস্তব পরিস্থিতি কিন্তু অন্য কথা বলে। নতুন হাইওয়ে কত কিলোমিটার তৈরি হয়েছে তা খাতায়-কলমে লেখা হয়। তবে চোখে দেখা যায় কি?

I নাকি ইনফ্লেশন নিয়ন্ত্রণ। খাদ্য পণ্যের মুদ্রাস্ফীতির হার কমেছে। কিন্তু তার দরুন সর্বস্বান্ত হচ্ছে কৃষক। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য রসিকতায় পর্যবসিত।

J জনধন প্রকল্প নিয়ে ঢক্কানিনাদের অন্ত নেই। সকলের জন্যে ঘটা করে ব্যাঙ্কের খাতা খুলে দেওয়া হল। ভালো কথা। যাঁদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয় তাঁরা দিন নয়, মাস নয় বছরের শেষে কত টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেবেন? আর টাকা জমা না থাকলে টাকা তোলবার প্রশ্নই নেই। এই সুবাদে ব্যাঙ্ক অবিশ্যি ব্যাবসার সুযোগ ছাড়তে রাজি নয়। ব্যাঙ্কে টাকা জমা-তোলা না হওয়ায় বছর শেষে গ্রাহকের খাতায় একটা বকেয়া অঙ্ক লিখে দেওয়া হয়। গ্রাহক এখন যায় কোথায়!

K নাকি কেদারনাথ যাত্রার পথ সুগম করে দেওয়ার ব্যবস্থা। সওয়া-শো কোটি ভারতবাসীর কতজন কেদারনাথ পরিক্রমায় যান? উত্তর খোঁজা অনর্থক। প্রাকৃতিক দুর্যোগে কেদারনাথের রাস্তা বিধ্বস্ত হয়েছিল। সেই রাস্তার পুনর্নির্মাণ নাকি উল্লেখ করার মতো সাফল্য!

L বলতে এলইডি বাল্ব। এলইডি বাল্ব ব্যবহার করলে বিদ্যুতের সাশ্রয় হয়। কাজেই গ্রাহকের অর্থ সাশ্রয়। প্রযুক্তি আপন গতিতে এগিয়ে চলে। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ নিজের স্বার্থে উৎকৃষ্টকে বেছে নেয়। এর মধ্যে চৌকিদারের কৃতিত্ব কোথায়?

M মানে যে মেক ইন ইন্ডিয়া সেটা এতদিনে সকলেই জেনে গেছেন। একইসঙ্গে সকলে জেনে গেছেন যে মেক ইন ইন্ডিয়া বলে চিনের পণ্যকে এদেশে অবাধে বাণিজ্য করার সুযোগ প্রদান। প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত: তিন হাজার কোটি টাকা খরচ করে নির্মিত বল্লভ ভাই প্যাটেলের মূর্তি।

N নাকি এনজিও বা অসরকারি সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণ। দেশে কতগুলি এনজিও সক্রিয়? সরকারের খাতায় হিসেব আছে। সরকারের অনুমোদন নিয়েই সংস্থাগুলি অনেকদিন ধরে নিজের নিজের কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে চলেছে। হঠাৎ করে তাদের ক্রিয়াকর্মাদিকে নতুন করে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কোন সাফল্য পাওয়া যাবে কে জানে!

O তিনি জানিয়েছেন 'ও' মানে দেশে অপটিক্যাল ফাইবার মারফত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। উনিশ-শো আশির দশকে ভারতবর্ষে অপটিক্যাল ফাইবারের প্রবর্তন। সেই ব্যবস্থা যথাযথভাবে প্রযুক্ত না হলে তিনি ক্ষমতাসীন হওয়ার আগেই দেশজোড়া টেলিযোগাযোগ পরিষেবা এত সুসংহত হতে পারত কি? চৌকিদার কেন অযথা কৃতিত্ব দাবি করছেন?

P অক্ষরের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলছেন প্রধানমন্ত্রী পাসপোর্ট প্রকল্প। তিনি কুর্সিতে বসার আগেই ব্যবস্থাটিকে সুগম করা হয়েছিল। একটা মোহর লাগিয়ে তিনি ব্যবস্থাটির সাফল্য দাবি করছেন। চমৎকার!

Q বলতে কুইক লোন বা ঊনষাট মিনিটে ঋণ অনুমোদনের কথা বলা হয়েছে। আদানি, আম্বানি হয়তো এত কম সময়ে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেয়ে থাকেন। কৃষি, শিল্প, গাড়ি বা বাড়ির জন্যে এত কম সময়ে অন্য কেউ ঋণ পেয়ে থাকলে তাঁর নাম-ছবি মায় বাড়ি-হাঁড়ির খবরাখবর নিশ্চয়ই সংবাদ শিরোনামে দেখা যেত।

R মানে রোড কনস্ট্রাকশন বা সড়ক নির্মাণ। রাস্তা তৈরির বিজ্ঞাপন যত দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া হয় তার এক শতাংশ গতিতে সড়ক নির্মিত হলে পথপরিক্রমা সুগম হত। বরং R বোঝাতে রাফাল চুক্তির কথা উল্লেখ করলে বিষয়টা সর্বাঙ্গসুন্দর হত।

S বলতে যথারীতি সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের সাফল্য উচ্চারিত হয়েছে। বিষয়টির সত্য-মিথ্যা নিরূপণে অনেক কাটাছেঁড়া হয়েছে। বিদেশি সংবাদমাধ্যম ছবিসহ প্রমাণ দাখিল করেছে যে বালাকোট বিমানহানায় দুটি কাক আর ক-টি পাইন গাছ বাদে কারোর কোনো ক্ষতি হয়নি।

T মানে টয়লেট বা শৌচাগার নির্মাণ। বেশি পরিশ্রমের দরকার নেই। সকালের দিকে রেলপথে ভ্রমণের সময় রেললাইনের দু-দিকে তাকালেই এই প্রকল্পের সাফল্য চোখে পড়ে। সড়কের পাশেও একই দৃশ্য।

U অর্থাৎ উজ্জ্বলা যোজনা। এই প্রকল্প নিয়ে চৌকিদার সবসময় সোচ্চার। প্রচার করার মতো একটি যথার্থ প্রকল্প। গরিব মানুষের ঘরে বিনামূল্যে এলপিজি গ্যাস সংযোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। প্রথম সিলিন্ডারটিও বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। তবে গ্যাস জ্বালানোর চুলাটির দাম কে দেয় তা অবিশ্যি জানা নেই। আর এই সুবাদে সমস্ত গ্যাস সিলিন্ডারের দাম তাঁর উদ্যোগে দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়েছে। সবরকমের এলপিজি ব্যবহারকারীর পয়সা ছিনিয়ে নেওয়ার এ এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

V বারাণসীর উন্নয়ন তাঁর স্বপ্নের প্রকল্প। নিজের নির্বাচনী ক্ষেত্র বলে কথা। স্থানীয়দের অভিজ্ঞতা বাদ দিলেও ইদানীংকালে যাঁরা বারাণসীতে গেছেন তাঁদের কাছেই শোনা যায় কীভাবে একটা ঐতিহ্যশালী শহরকে লণ্ডভণ্ড করে দেওয়ার কাজ চলছে।

W অর্থাৎ ওয়ার মেমোরিয়াল। সেটা কী বস্তু? নতুন দিল্লির কেন্দ্রে অবস্থিত ইন্ডিয়া গেট এলাকায় তাঁর উদ্যোগে তৈরি হয়েছে একটি যুদ্ধ স্মারক। বিভিন্ন সময় যুদ্ধে যেসব সৈন্য মারা গিয়েছেন তাঁদের স্মরণে নির্মিত এই স্থাপত্য দেশের বিকাশে কত প্রয়োজন তা বলা মুশকিল হলেও একটা কথা নিশ্চিন্তে বলা যায় যে এর ফলে ইন্ডিয়া গেট এলাকার সৌন্দর্যহানি হয়েছে।

X বলতে দাবি করা হয়েছে দেশদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির এক্সপোজার বা উন্মোচন। বাস্তবে বিরুদ্ধ মতের মানুষকে হেনস্থা থেকে হত্যা করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য তা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত।

Y তো এখন যোগ আসনের প্রতীক। যোগাসন বা যোগা ব্যাখ্যার সময় তিনি আবেগমথিত কণ্ঠে আসনের বিভিন্ন শৈলী প্রচারমাধ্যমের সামনে প্রদর্শন করতে অভ্যস্ত।

Z অর্থাৎ সন্ত্রাসী হানা-মুক্ত দেশ। জিরো টেররিস্ট অ্যাটাকের ব্যাখ্যা এমনভাবেই করা হচ্ছে। অথচ প্রায়শই সন্ত্রাসী হানার খবর প্রচারিত হয়। ইউপিএ আমলের তুলনায় তাঁর আমলে দেশে সন্ত্রাসবাদী হামলা বেড়েছে।

চৌকিদার ও তাঁর তাঁবেদাররা এখন নিজেদের চৌকিদার বলে দাবি করছেন। চৌকিদারেরা নিজেদের নির্বাচনী ইশতেহারে A থেকে Z সাফল্যের কথা লিপিবদ্ধ করেননি। কেন? সাফল্যের দাবিদারই জবাব দিতে পারেন। তবে দেশের হিন্দি হার্টল্যান্ড বা হিন্দি-হিন্দুত্বের হৃদয়পুরে অতি সন্তর্পণে ইংরেজির এই নতুন বর্ণমালা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ছোটো ছোটো ভিডিয়ো ক্লিপিংসের মাধ্যমে চুপচাপ চলছে ধারাবাহিক প্রচার। এমনকী যাদের ভোটার হতে এখনও অনেক দেরি তাদের কাছেও সুকৌশলে এই নতুন বর্ণমালা পৌঁছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার বিষময় ফল যে কত সুদূরপ্রসারী তা নিয়ে কোনো ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এই পরিসরে শুধু একটাই প্রশ্ন— A থেকে Z পর্যন্ত সবই যখন হয়ে গেছে তখন দেশজুড়ে দৌড়ঝাঁপ করে হুংকার হেঁকে শুধু সীমান্ত সন্ত্রাসের কথা বলা হচ্ছে কেন? গোপনে-সন্তর্পণে যেসব কৃতিত্ব-সাফল্যের দাবি করা হচ্ছে তা প্রকাশ্যে জানিয়ে ভোট ভিক্ষা করলেই তো বিষয়টা অনেক সংগত হয়।

সমসাময়িক

জুলিয়ান আসাঞ্জ এক বিপজ্জনক সন্ত্রাসবাদীর নাম

জুলিয়ান আসাঞ্জকে গ্রেপ্তার হতেই হত। আজ নয়তো কাল। গণতন্ত্রের তথাকথিত পূজারি এবং বাক্‌স্বাধীনতার ধ্বজাধারী দেশগুলির আসল চেহারা সর্বসমক্ষে ফাঁস করে দিয়ে একজন মানুষ বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এটাকে পশ্চিমি বিশ্বের পক্ষে মান্যতা দেওয়া সম্ভব নয়। জুলিয়ান আসাঞ্জ, উইকিলিক্সের প্রতিষ্ঠাতা, পুঁজিবাদের চোখে তাই এক ভয়ংকর বিপজ্জনক সন্ত্রাসবাদী, যিনি তথ্য নামক একবিংশ শতাব্দীর সবথেকে শক্তিশালী অস্ত্রটির গণতন্ত্রীভবন ঘটিয়ে দিয়ে প্রায় নৈরাজ্য এনে দিয়েছেন মুক্তচিন্তার আঁতুড়ঘরে। তাই কখনো তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনতে হয়, আবার কখনো তথাকথিত বায়োপিকের আড়ালে তাঁর চরিত্রহনন ঘটাতে হয়। এসব করেও যখন কাজের কাজ হয় না, এবং ক্রমে ক্রমেই সমগ্র পৃথিবীর একটা বড়ো অংশের মানুষের কাছে আইকন হয়ে উঠতে থাকেন আসাঞ্জ, তখন হাতে শেষ অস্ত্র একটাই পড়ে থাকে। সোজাসুজি গ্রেপ্তার। অন্তত এই ক্ষেত্রে উন্নত পশ্চিম নরেন্দ্র মোদীর ভারতবর্ষের থেকে আলাদা কিছু নয়। সামান্য তফাত যেটুকুতে, তা হল ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশে মুক্তচিন্তার উপাসকের উপর সরাসরি চাপাতির কোপ পড়ে। আর পশ্চিমি দুনিয়া একটা পর্যায় অবধি মুক্তচিন্তাকে অনুমোদন দেয় যতক্ষণ তা পুঁজিবাদের পক্ষে নিরাপদ। সেই লক্ষণরেখা অতিক্রম করলেই রাষ্ট্র তার সহনশীলতার মুখোশ নামিয়ে ফেলতে দুই বার ভাববে না।

উইকিলিক্সের মাধ্যমে বহু গোপনীয় নথি ফাঁস করার কারণে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে আসাঞ্জের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল অনেক আগেই। গ্রেপ্তার এবং যুক্তরাষ্ট্রে ফেরত পাঠানোর ভয়ে ২০১২ সালের আগস্ট থেকে লন্ডনে ইকুয়েডর দূতাবাসে অবস্থান নেন আসাঞ্জ। এরপর ইকুয়েডর সরকার আসাঞ্জের রাজনৈতিক আশ্রয় মঞ্জুর করেন। গত ১১ এপ্রিল ইকুয়েডর কর্তৃক ওই রাজনৈতিক আশ্রয় বাতিলের সিদ্ধান্তে আসার পর গ্রেপ্তারের পদক্ষেপ নিল লন্ডন পুলিশ। 'বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন এবং দৈনন্দিন প্রোটোকল লঙ্ঘনের' কারণে তাঁর 'অ্যাসাইলাম' বাতিলের পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন ইকুয়েডরের রাষ্ট্রপতি লেনিন মোরেনো। তবে বর্তমান রাষ্ট্রপতির এমন সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়েছেন সাবেক রাষ্ট্রপতি রাফায়েল কোরেয়া, যাঁর সময়ে আসাঞ্জকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। মোরেনোকে 'বিশ্বাসঘাতক' হিসাবে অভিহিত করেছেন তিনি। এই তথ্যটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আসাঞ্জের গ্রেপ্তারের পেছনে নয়া সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার যে ষড়যন্ত্র রয়েছে, কোরেয়া এবং মোরেনো তার দুই গুরুত্বপূর্ণ ঘুঁটি।

আসাঞ্জকে আশ্রয় দিয়েছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান কোরেয়া, এবং এর ফলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আন্তর্জাতিক বামপন্থী ঘরানার কাছে একটি সমাদৃত মুখবিশেষ। সেই সময়ে কোরেয়া তাঁর দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঢেলে সাজাচ্ছিলেন। এক নতুন সংবিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে নাগরিক অধিকারের বিস্তৃতি এবং রাষ্ট্রপতির হাতে আরো বেশি ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, এই দুই বিপরীতমুখী ধারাকে মেলানোর চেষ্টায় ছিলেন কোরেয়া। আর পুরো গল্পটায় একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছিল তেলের রাজনীতি।

ইকুয়েডরের আয়ের একটা বড়ো উৎস হল দেশের মধ্যে অবস্থিত তেলের খনি। তেল রপ্তানির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে দেশের ভেতর উন্নয়ন করবার একটা প্ল্যান ছকেছিলেন কোরেয়া, যার অঙ্গ ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং আয়ের পুনর্বণ্টন। ২০১৪ সাল পর্যন্ত এই পরিকল্পনা কাজে লেগেছিল। কোরেয়া তখন সারা দেশের বামপন্থীদের চোখে হিরো। তিনি আসাঞ্জকে আশ্রয় দিয়ে পশ্চিমি দুনিয়াকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছেন, আবার একইসঙ্গে দেশের মধ্যে আর্থ-সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়ছেন। কিন্তু ২০১৪ সালে ছবিটা পালটে গেল যখন পৃথিবীজোড়া তেলের দাম দুম করে পড়তে শুরু করল। মরিয়া হয়ে কোরেয়া যেটা করতে গেলেন, তিনি খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের উত্তোলন অবাধ করে দিলেন। এর ফলে তাঁর সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষ বাধল দেশের বামপন্থী শক্তিগুলি ও আদিবাসী ভূমিপুত্রদের, কারণ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের খনিগুলি ছিল আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাতেই। আদিবাসী ও গ্রামবাসীদের প্রতিরোধকে নির্মমভাবে দমন-পীড়ন এবং তাঁদের নিজস্ব

প্রতিষ্ঠানগুলিকে বলপূর্বক সরকারি অধিগ্রহণের ফলে দ্রুত বামেদের কাছে অপ্রিয় হতে শুরু করলেন কোরেয়া। তিনি এর জবাব দিলেন হাজার হাজার বামপন্থী, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কার্টুনশিল্পীদের জেলে পুরে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর এই আগ্রাসনের ফলে দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাতে থাকা কোরেয়ার কাছে তখন তুরুপের তাস একটাই, জুলিয়ান আসাঞ্জ। তিনি আসাঞ্জকে আশ্রয় দিয়েছেন, এখন তাঁকেই বার বার তুলে ধরে বাইরের পৃথিবীর কাছে নিজের উদারতার প্রমাণ দিতে লাগলেন। এমনকী আসাঞ্জের নিরাপত্তা বাড়িয়েও দিলেন তিনি। ইকুয়েডরের দূতাবাসে বারে বারে বিভিন্ন রঙের বামপন্থী এবং প্রগতিশীল মানুষজনের আনাগোনা ঘটতে লাগল। দেশের নানা প্রান্তে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বামপন্থী সম্মেলন শুরু করলেন কোরেয়া, যেখানে অংশগ্রহণ করলেন বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক প্রগতিবাদীরা। এর ফলে যেটা দাঁড়াল, দেশের মধ্যে একদিকে তিনি বিরোধীদের উপর, যাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে বামপন্থীরা আছেন, দমন-পীড়ন নামিয়ে আনলেন আর অন্যদিকে বহির্বিশ্বের কাছে নিজের বাম মুখটি উজ্জ্বল করতে চাইলেন।

কিন্তু তেলের দাম পড়তেই থাকল, এবং কোরেয়া এত কিছু করেও তাঁর হৃত জনপ্রিয়তা ফিরে পেলেন না। তিনি তখন নিজের কর্তৃত্ব অটুট রাখবার উদ্দেশ্যে বিশ্বস্ত সঙ্গী লেনিন মোরেনোকে রাষ্ট্রপ্রধান বানালেন। আর খেলাটা ঘুরে গেল এখানেই। মোরেনো ক্ষমতায় এসেই প্রথম যে কাজটা করলেন তা হল কোরেয়ার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। কোরেয়ার বিশ্বাসভাজনদের জেলে ঢুকিয়ে এবং গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি থেকে অপসারিত করে মোরেনো নিজের লোকেদের বসালেন সেখানে। সেইসঙ্গে যেটা করলেন, কোরেয়ার নেতৃত্বে ইকুয়েডর সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের যে রাস্তায় হাঁটছিল তার থেকে সম্পূর্ণ সরে এসে নয়া-উদারনীতিকে আলিঙ্গন করলেন তিনি। কোরেয়ার জমানায় নয়া সাম্রাজ্যবাদ ইকুয়েডরের মাটিতে দাঁত ফোটাতে পারেনি। মোরেনো এসে তাদের মুখে হাসি ফোটালেন। দেশে গণতন্ত্র ফেরাবার নাম করে অবাধ বেসরকারিকরণ করলেন সংবাদমাধ্যমের। আর যেটা সবথেকে উল্লেখযোগ্য, কোরেয়ার নেতৃত্বে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইকুয়েডর যেভাবে লাতিন আমেরিকার লেফট ব্লকের একটি অন্যতম অংশ হয়েছিল, সেই ট্রাডিশন থেকে বেরিয়ে আসলেন মোরেনো। এই বেরোনোর দুটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হল, ভেনেজুয়েলার বামপন্থী রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরোর প্রতি সমর্থন ভেঙে মোরেনো সমর্থন জানালেন আমেরিকার মদতপুষ্ট হুয়ান গুয়াইদোকে, আর একইসঙ্গে তেলের দাম পড়ে যাবার কারণে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে বাঁচবার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ) থেকে অর্থসাহায্য নিলেন, যেটা কোরেয়া হাজার সমস্যাতেও কখনো করেননি। অর্থাৎ, ক্রমে ক্রমেই মোরেনো ঝুঁকে পড়লেন আমেরিকার উপর নির্ভরশীল একটি অবস্থানে।

ঠিক এই জায়গা থেকেই আসাঞ্জের গ্রেপ্তার হবার ঘটনাকে দেখতে হবে। মোরেনোর ক্রমবর্ধমান মার্কিন-প্রীতি, এবং পুঁজিবাদের থেকে অর্থসাহায্য নেওয়া, এই দুইয়ের বিনিময়-মূল্য একটা কিছু হতেই হত। শাইলকের মতোই, এক পাউন্ড মাংসের অধিকার পশ্চিমি বিশ্ব ছাড়তে চাইবে না। তাদের কাছে জুলিয়ান আসাঞ্জ আইসিস বা লাদেনের থেকে অনেক বড়ো সন্ত্রাসবাদী— কারণ লাদেনের রাজনীতিকে মুক্তিকামী গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ ঘৃণা করতে বাধ্য। তাই আল-কায়েদা বা আইসিস যতদিন টিকে থাকবে পুঁজিবাদের ততই লাভ, কারণ সেই জুজু দেখিয়ে সে নিজের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু আসাঞ্জ পুঁজিবাদকে বাইরে থেকে আঘাত হানেননি, অথবা সশস্ত্র জনতার বিপ্লবের অংশীদারও হননি। তিনি ভেতর থেকে অন্তর্ঘাত করে তথাকথিত মুক্তচিন্তার হাঁড়িটি খোলা হাটে ভেঙে দিয়েছেন। তাই আসাঞ্জ যতদিন থাকবেন, এডওয়ার্ড স্নোডেন যতদিন থাকবেন, পুঁজিবাদ ও নয়া-সাম্রাজ্যবাদ ততদিন সুরক্ষিত নয়। কারণ তাদের তাত্ত্বিক বৈধতার ভিতটাই ভেঙেচুরে দিয়েছেন এই একলা মানুষেরা, প্রায় একক প্রচেষ্টায়। এই পৃথিবীটা কীভাবে জনগণের হাত থেকে কতিপয় ব্যবসায়ী সংঘের হাতে দখল হয়েছে, কীভাবে 'নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি'রা রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্মসাৎ করে ব্যক্তিগত সম্পদের পাহাড় গড়েছে, কীভাবে নয়া-উদারনীতি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ধোঁকার টাটি দিয়ে পৃথিবীব্যাপী তার অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটাচ্ছে, তার হুলিয়া ফাঁস করেছেন যিনি, তাঁর অস্তিত্বটাই বিপজ্জনক। কোরেয়াকে বাগে পাওয়া যায়নি, কারণ দেশের ভিতর নানাপ্রকার দমন-পীড়নের পরেও কোরেয়া তাঁর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অবস্থান থেকে নড়েননি। নতুন অবতার মোরেনোর উপর চাপ সৃষ্টি করা সহজ ছিল, কারণ তিনি শুরু থেকেই নয়া-উদারবাদের বিশ্বস্ত ভৃত্য।

যে পৃথিবীতে গৌরী লঙ্কেশদের রক্তাক্ত লাশ মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে, সুজাত বুখারিরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যান মৌলবাদীর গুলিতে, সেখানে জুলিয়ান আসাঞ্জ এতদিন বেঁচে আছেন এটাই বরং আশ্চর্যের ব্যাপার। কিন্তু তার থেকেও একটা আশ্চর্যের ব্যাপার ঘটছে, যেটা ক্লাসিকাল মার্কসবাদীরা বুঝতে পারছেন কি না জানা নেই। শ্রেণিনির্ভর আন্দোলন, সমষ্টির লড়াই এবং সংঘের প্রতিরোধ, এই চিরাচরিত পদ্ধতিগুলির থেকেও আধুনিক পৃথিবীতে মাঝে মাঝেই বেশি অভিঘাতসম্পন্ন হয়ে উঠছে একক ব্যক্তির অন্তর্ঘাত। বিপ্লব নয়, উচ্চকিত আন্দোলনও নয়,

অনেকটা নবারুণ ভট্টাচার্য বর্ণিত ফ্যাতাড়ুসম আঘাত। ভেতর থেকে ফাটল ধরিয়ে দেওয়া। সমষ্টির প্রতিরোধ অনস্বীকার্য, তার উজ্জ্বল ইতিহাসের দায়ভাগ বর্জন করবার প্রশ্নই নেই। কিন্তু তার পাশাপাশিই ব্যক্তিক প্রত্যাঘাতের এই স্বর্ণখচিত অধ্যায়গুলিকে মার্কসবাদী তাত্ত্বিকেরা কবে তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক হলফনামার মধ্যে সসম্মানে অন্তর্ভুক্ত করবেন?

নির্বাচন কমিশন? মোদী কমিশন?

‘বাবুরাম সাপুড়ে’ কবিতাটি বোধহয় নির্বাচন কমিশনের কর্তারা, বিশেষত, দিল্লির মান্যবররা ভালো করে পড়েছেন। তাই তাঁদের যত আস্ফালন কেন্দ্র সরকারের বিরোধীদের ওপর। দেশের তদারকি প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর দলের সভাপতির কোনো অপরাধ তাঁদের চোখে পড়ে না। তাঁরা হয় টিভি দেখেন না, নয় কাগজ পড়েন না, নয়, চক্ষু-কর্ণ দুইটি ঢাকা। তাঁদের মাথায় ‘কত্তার ভূত’ চেপেছে। কত্তাকে কিছু বলার ক্ষ্যামতা তাঁদের নেই।

কত্তা আমেদাবাদে ভোট দিতে গেলেন ভোটের দিন ‘রোড শো’ করে। কমিশন চুপ। কত্তা প্রতিদিন বলছেন দেশের সেনাবাহিনীর কথা, বালাকোটের কথা, পাকিস্তানে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের কথা। কমিশন বোবা, কালা, কুম্ভকর্ণ। অমিত শাহ্ বলছেন দেশের বায়ুসেনা ‘মোদীকা সেনা’— সেসব শুনতে পাচ্ছেন না কমিশন। যোগী বিজেপি-র দ্বিতীয় সারির নেতা। তাঁকে ৭২ ঘন্টা নির্বাচনী জনসভা বন্ধ রাখতে বললেন। তাও একইসঙ্গে মায়াবতীর ৪৮ ঘন্টা কেড়ে নিয়ে। এসবও করেছেন সুপ্রিম কোর্ট তাদের ক্ষমতা দেখানোর কথা বলার পর। যোগী সেইসময় কিন্তু টিভির পর্দায় নানা কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করে বেড়ালেন। ৭২ ঘন্টা পার করেই বলে উঠলেন, এ দেশ হিন্দুর দেশ। সরাসরি ধর্মপ্রচার। ভোটের নামে সাধ্বী প্রজ্ঞা যেসব মন্তব্য করছেন, তাতে তাঁর নির্বাচনে দাঁড়ানোই নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত। ক্ষমতা নেই। মুম্বই বিস্ফোরণে শহিদ হেমন্ত কারকারে অত্যাচারী, সংঘী সাধ্বী বাবরি মসজিদের মাথায় চড়ে মসজিদ ভেঙেছেন— এসব বলার পর শুধু তাঁর বিরুদ্ধে দুটি এফআইআর-এর নির্দেশ। যে এফআইআর কোনোদিনই কার্যকর হবে না। প্রজ্ঞার ‘শাপ’ তো আসলে খুনের হুমকি। আদালতও তো নড়েচড়ে বসতে পারে। আসানসোলে বাবুল বড়াল (সুপ্রিয়) পুলিশ আধিকারিককে হুমকি দিলেন, সেখানেও শুধুই এফআইআর। উত্তরপ্রদেশে আজম খানকে সতর্ক করলেন, নির্বাচনী সময় কাড়লেন, কিন্তু বিজেপি-র অজস্র নেতা যে প্রতিদিন নির্বাচনী বিধি ভেঙে ধর্মের নামে ভোট চাইছেন তার কী হবে?

নভজ্যোৎ সিং সিধু একজোট হয়ে ধর্মরনিরপেক্ষ ও সংখ্যালঘুদের ভোট দিতে বলায় যে শাস্তি পেলেন তা কিন্তু উমাভারতী পেলেন না।

মহারাষ্ট্রের রাজ ঠাকরে ভোটে লড়ছেন না। শুধু মারাঠিদের সঙ্গে বিজেপি কীভাবে প্রতারণা করেছে, পুলওয়ামা আক্রমণ যে মোদীর সাজানো, আবার বিস্ফোরণের চক্রান্ত হবে— এসব বলে চলেছেন— তাতে ক্ষিপ্ত মোদীর কমিশন। তাঁর জনসভা বন্ধের নিদানপত্র।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন কমিশন তুলনামূলকভাবে কড়া। তৃতীয় দফায় ৯২% বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়েছে। কিন্তু মুর্শিদাবাদে একজনের প্রাণ গেল। কমিশন বলল, বুথের বাইরের ঘটনা। কিছু নাকি করার নেই।

নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক এমন মন্তব্য করছেন, যাতে মনে হচ্ছে তিনি দলীয় প্রতিনিধি। সরকারি লোক নন। নির্বাচনের মাঝপথে কেন্দ্রীয় সরকারে ১১জন সরাসরি, ইউপিএসসি-র কোনো পরীক্ষা ছাড়াই যুগ্মসচিব পদে যোগ দিল। নির্বাচন কমিশন দেখেও দেখল না।

মোদী-অমিত শাহের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা দেখে মনে হচ্ছে— এ যেন বিজেপি-র সি টিম। অনেকেই ব্যঙ্গ করে বলছেন, মোদী কমিশন। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই নির্বাচন কমিশনে নিজের লোক ঢোকানো শুরু করেছেন মোদী-শাহের সরকার। নির্বাচন কমিশনের যে বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, টি এন শেষন— তার মর্যাদা এরা বজায় রাখতে পারছেন না বলে অনেকেই মনে করছেন। অতীতে বালসাহেব ঠাকরের ভোটাধিকার বাতিল হয়েছিল। আজ মোদী-অমিত শাহের উদ্দেশে সামান্য বার্তা পাঠানোর সৎ সাহস নেই। তবু মোদীর গুণগান সম্পন্ন ‘বায়োপিক’ বন্ধ করে কিছুটা মুখরক্ষা করেছে কমিশন।

যদিও একথা ঠিক পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন অতীতের তুলনায় শান্তিপূর্ণ হচ্ছে। এ পর্যন্ত মাত্র দুজন নিহত। একজন সিপিএমের অজয় মণ্ডল। অন্যজন কংগ্রেসের টিয়ারুল হক। অন্য বার অনেক বেশি মানুষ খুন হয়েছেন। এবার তাকে সংখ্যায় কমিয়ে রাখা সাফল্য।

কিন্তু ইভিএম নিয়ে সারা দেশে যা ঘটছে তাতে অনেকেই শঙ্কিত। অজস্র অভিযোগ ইভিএম ঘিরে। বোতাম টিপলে শুধু পদ্মে আলো জ্বলে বলে অভিযোগ এসেছে। শশী থারুর,

অখিলেশ যাদব, পিনারাই বিজয়ন— সবাই অভিযোগ করেছেন। বিরোধীরা চেয়েছিলেন, ব্যালটে ভোট— মোদীর কমিশন মানেনি। এমনকী ৫০% বুথে ভিভিপ্যাট গণনার দাবিও অস্বীকার করা হয়েছে। মাত্র ৫% বুথের ভিভিপ্যাট গণনা হবে। এ তো প্রহসন।

প্রায় দু-মাস ধরে ভোট চললে, ভোট গণনার জন্য তিন দিন লাগে লাগুক— দেশবাসী অপেক্ষা করতে পারবে।

কারণ, মহারাষ্ট্রের প্রয়াত গোপীনাথ মুণ্ডের মেয়ে পঙ্কজ মুণ্ডে বলেছেন, ক্ষমতায় এলে তাঁরা সংবিধান বদলে দেবেন। কমিশন স্পিকটি নট। সাক্ষী মহারাজ বলছেন ২০২৪-এর পর আর ভোট হবে না। সবাই শুনলেও কমিশন শুনতে পাননি।

বিরোধীদের উচিৎ কমিশনের দিল্লি দপ্তর ঘেরাও করা, যাতে কমিশনের কানে জল ঢোকে। সুপ্রিম কোর্টেও যাওয়া। যদিও প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠার পর সুপ্রিম কোর্ট কতটা সাহস দেখাতে পারবে চিন্তার বিষয়। ইতিমধ্যেই তো হার্দিক প্যাটেলকে দাঁড়াতে নিষেধ করা হয়েছে। শুধু বক্তৃতায় দেশদ্রোহ। আর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মানুষ মারা সাধ্বী প্রজ্ঞা অসুস্থতার কথা জানিয়ে জামিনে থেকে নির্বাচন লড়ছেন, তার ব্যাপারে আদালত চুপ।

কমিশনের কিছু আঞ্চলিক কর্মকর্তা অবশ্য সাহস দেখাচ্ছেন। আমেথিতে রাহুল গান্ধীর মনোনয়ন পত্র বাতিলের আবদার তাঁরা রাখেননি।

ছোটোদের কাছে বড়োরা শিখলেন। দেশের মঙ্গল। দশেরও মঙ্গল। এবং নির্বাচন কমিশনেরও। নাহলে আগামীতে কমিশনটাই তুলে দেবে ফ্যাসিস্ট সরকার।

আম্পায়ার যদি দলের হয়ে খেলে খেলার ফল যা হয়, তাই কি হবে?

স্বপ্ন ও সত্য

আমাদের স্বনামধন্যা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী ওমুক ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছেন। স্বপ্ন দেখায় কোনো দোষ নেই। যে-ভাষাবোধ ও জ্ঞান নিয়ে তিনি এতদূর এসেছেন, তা তো ইচ্ছাশক্তি ও লড়াই করার মানসিকতার জোরে। এর সঙ্গে নৈতিকতা বা দূরদৃষ্টির কোনো সম্পর্ক নেই। অন্তত এক্ষেত্রে নেই। তাঁর স্বপ্ন তিনি পশ্চিমবঙ্গে ৪২-এ ৪২টি আসনই পাবেন (যেহেতু সব ক-টি আসনেই প্রার্থী তিনি নিজে!), বিজেপি সরকার গড়ার মতো যথেষ্ট আসন পাবে না, ফলে ছোটো ছোটো আঞ্চলিক দলগুলি তাঁকেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাইবেন। তাঁর ধারণা লোকে তাঁকে দেবীর আসনে বসিয়ে রেখেছে। এ নিয়ে আমাদের কোনো মন্তব্য নেই আপাতত।

এই দেবীর মুখনিঃসৃত কয়েকটি বাক্য বার বার কানে এসেছে, যেমন, 'তুই কে হে হরিদাস?...', 'একেবারে ঢুকিয়ে দেব— হ্যাঙ্গারে ঢুকিয়ে দেব...', 'আগে দিল্লি সামলা, তারপর বাংলা সামলাবি...' ইত্যাদি। ভাবা যাক ভারতের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে এইসব বাণী নির্গত হচ্ছে! বাঙালিকে আর কত অবমাননা সহ্য করতে হবে, ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

কিন্তু তাঁর স্বপ্ন যে সফল হবার নয় তা সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়। তাঁর স্বরূপ কি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে পড়েনি? দেশের মানুষ কি এতই নির্বোধ যে সারদাকাণ্ডে, রোজভ্যালি কাণ্ডে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করার পরও তাঁকে সবাই চোখ বুজে ভোট দেবে? নারদাকাণ্ড বিখ্যাত সব ব্যক্তিদের লক্ষ লক্ষ টাকা হাত পেতে নিয়ে আত্মসাৎ করার পরও মানুষ তাঁদের ভোট দেবে? ইতিমধ্যে তিনি মানবাধিকার কমিশন, মহিলা কমিশন, রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং সার্ভিস কমিশনগুলি প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছেন। পুলিশবাহিনীর নৈতিকতা ধ্বংস করে দিয়েছেন অন্যায় কাজ করিয়ে। যাদের চোখের সামনে গুন্ডামি ও তোলাবাজি আর উৎকোচ-গ্রহণের ঘটনা অবিরত ঘটে যাচ্ছে তাঁরা এইসব কুকর্মের নায়কদের ভোট দেবেন?

তাঁর স্বপ্ন, যেমন অনেকে বলতে শুরু করেছেন, তিনি হবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী আর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র (ইনি ইতিমধ্যেই স্বনামধন্য, তাই তাঁর নাম না-বললেও চলে) শ্রীযুক্ত ওমুক হবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। এই শ্রী ওমুক, অর্থাৎ স্বনামধন্য ভাইপোটি, সম্প্রতি একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে নানা কথা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে তাঁর স্ত্রীকে দমদম বিমানবন্দরে হেনস্তা করা হয় রাজনৈতিক শত্রুতার কারণে। সহজ হিসেব। কাস্টমস্ কেন্দ্রীয় তথা বিজেপি সরকারের অধীন আর ভদ্রমহিলা প্রখ্যাত তৃণমূল নেতা শ্রী ওমুকের স্ত্রী। তিনি নানারকম চ্যালেঞ্জ বাতাসে ছুড়তে থাকেন। এর যে কী দরকার ছিল তা বুঝতে আমাদের কিছু সময় লেগেছে। আসল ঘটনা যা ঘটেছে বলে আমরা হাওয়ার কাছ থেকে শুনতে পেয়েছি, তা হল তিনি একাধিক সুটকেস নিয়ে দ্রুত কাস্টমস্-এলাকা পার হয়ে যাচ্ছিলেন যখন কাস্টমসের লোক তাঁকে আটকায়— কী

আছে সেইসব সুটকেসে দেখতে চায়। এটাই, বলা বাহুল্য, কাস্টমসের কাজ। কিন্তু বিধাননগরের পুলিশ কমিশনারের কাছে এই মর্মে নির্দেশ যায় যে ওই মহিলাকে মালপত্রসহ বের করে আনতে হবে। চাকরি বাঁচানোর জন্য ওই পুলিশকর্তাকে তা-ই করতে হয়। হাওয়ার কাছ থেকে শোনা আরো খবর, ওই ভদ্রমহিলার কাছে ২ কেজি সোনা ছিল। হাওয়ার কাছ থেকে পাওয়া খবরে আমরা কাউকে আস্থা রাখতে বলব না। আমরা কয়েকটি প্রশ্ন করব শুধু। পুলিশ কমিশনারমশাই কি সত্যিই অন্যায়ভাবে ওই মহিলাকে উদ্ধার করেন? কী কী ছিল ওই সুটকেসগুলিতে? ওই মহিলার জন্ম থাইল্যান্ডে, তাহলে তিনি কীভাবে ভারতের নাগরিক হলেন? বিবাহসূত্রে? তাঁর ক-টি পাসপোর্ট? হাওয়া জানিয়েছে তিনটি। তিনটি পাসপোর্ট কীভাবে একজন (যদি একথা সত্য হয়— হাওয়ার উপর তো আস্থা রাখা যায় না!) ব্যক্তি পেতে পারেন? তাহলে কি মহিলা কোনো দুষ্টচক্রের সঙ্গে যুক্ত? পাঠক এবং শ্রী ওমুক মার্জনা করবেন, প্রশ্নগুলি তোলা ছাড়া আমাদের মন শান্ত হচ্ছিল না। এইসব প্রশ্নের উত্তর কি কোনোদিন পাওয়া যাবে?

প্রশ্ন আরো অনেক আছে। উন্নয়ন জ্বলজ্বল করছে চারদিক— একজন হতদরিদ্র মানুষের গায়ে লম্পট জমিদারের ঝলমলে পোশাকের মতো। জৈব জ্বালানি পুড়িয়ে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ তৈরি করে অতিরিক্ত আলো তৈরি করা হচ্ছে। চারদিক উদ্ভাসিত। পাখিরা শহর থেকে পালিয়েছে। উদ্ভাসিত শুধু মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আর তাঁর কর্মচারীসম তোলাবাজ নেতাদের মুখগুলি। এ কোন শহর? এখন আর একে অনেকেই চিনতে পারেন না। যেন একটা মিথ্যার আবরণ ঢেকে রেখেছে সব ক্ষয়ক্ষতি, সব কুকথা, সব পাপ।

শেষ প্রশ্ন, কবে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ?

যাহা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যাহা সকলের চেয়ে পূর্ণ, যাহা চরম সত্য, তাহা সকলকে লইয়া; এবং তাহাই নানা আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়া হইয়া উঠিবার দিকে চলিয়াছে—আমাদের সমস্ত ইচ্ছা দিয়া তাহাকেই আমরা যে-পরিমাণে অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিব, সেই পরিমাণেই আমাদের চেষ্টা সার্থক হইবে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অশোক মিত্র ও *আরেক রকম*

সুজিত পোদ্দার

অশোক মিত্র প্রয়াত হন ১ মে ২০১৮। ১ এপ্রিল থেকে এক মাস কাল প্রায় অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। এই সময়ে বহু অনুরাগী, শুভানুধ্যায়ী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, পারিবারিক নিকটজনেরা *আরেক রকম* পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত লেখক, সম্পাদকমণ্ডলী, পাঠক এবং চেনা-অচেনা বহু মানুষ, প্রতিদিন হাসপাতালে সকাল-বিকেল শারীরিক অবস্থার খবর নিতে আসতেন। ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মীরাও নিষ্ঠার সঙ্গে ভালোবেসে ওঁকে সুস্থ করার চেষ্টা করেছেন। অশোকবাবুকে যতখানি দেখেছি, তিনি ছিলেন আদ্যোপান্ত রাজনৈতিক চিন্তায় আচ্ছন্ন মানুষ। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী হন। ১৯৮৬ সালে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। তারপরও কমবেশি ২০/২২ বছর সরাসরি রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সুবাদে বাম রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সঙ্গে ওঁর সরাসরি যোগাযোগ ছিল। রাজ্যের প্রায় সব বাম রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ওঁর বাড়ি যাতায়াত ছিল। শারীরিক কারণে অশোকবাবুকে জীবনের শেষ কয়েক বছর বহু বার হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হতে হয়েছিল। অশোকবাবুর পছন্দ-অপছন্দের বাছবিচার ছিল খুব সুনির্দিষ্ট। চেনা-অচেনা যেকোনো মানুষকে অপছন্দ হলে তিনি অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারতেন। পছন্দের মানুষের জন্য দ্বার সবসময়েই ছিল অবারিত। হাসপাতালে থাকাকালীন শুধু অপরিচিত মানুষ, ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য সেবাকর্মীদের সাহচর্যেই দিন কাটাতে হত। তিনি কারও কাজে সন্তুষ্ট না হলে অকপটেই জানিয়ে দিতেন। কিন্তু বিভিন্ন হাসপাতালে যখন চিকিৎসাধীন থাকতেন দেখেছি, প্রতিটি মানুষ, ডাক্তার বা হাসপাতালের প্রশাসনের লোকেরা প্রায় সকলেই প্রধানত ওঁর লেখার জন্য ওঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই ব্যাপারে রাজনৈতিক বিশ্বাস-অবিশ্বাস নির্বিশেষে সকলে ওঁকে শ্রদ্ধা করতেন। কেউ দৈনিক পত্রিকায় লেখা প্রবন্ধ পড়ে, কেউ অতীতের সাপ্তাহিক পত্রিকায় ইংরেজিতে লেখা প্রবন্ধ পড়ে ওঁদের শ্রদ্ধার কথা জানাতেন চিকিৎসার কারণে ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেও, বাম আন্দোলনের মধ্যে বা বামবিরোধী দলের অধিকাংশ নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে হয়তো মতের মিল ছিল না, তথাপি ওঁর নিষ্ঠা এবং পাণ্ডিত্যের জন্য সকলেরই ওঁর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল।

শেষ জীবনে *আরেক রকম* পত্রিকা ছিল ওঁর ধ্যান-জ্ঞান। এই পত্রিকার মান ঠিক রাখার চিন্তা ওঁকে সবসময় আচ্ছন্ন করে রাখত। ১ এপ্রিল ২০১৮, ওইদিনই হয়তো অশোকবাবু ওঁর জীবনের শেষ দিন, যেদিন তিনি নিজের মধ্যে শারীরিক এবং মানসিক চিন্তার শক্তি যেটুকু অবশিষ্ট ছিল সেটাকে উজাড় করে *আরেক রকম*-এর জন্য কিছু লেখার চেষ্টা করেছিলেন। ওইদিন সকালবেলাই হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করতে বলেন। ইতিমধ্যে বর্তমান সম্পাদক শুভনীল চৌধুরীকে খবর পাঠিয়েছেন, বাড়ি এসে ওঁর প্রবন্ধের অনুলিখনের জন্য। শুভনীল সকালবেলাই অশোকবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তিনি ওঁর জীবনের চিন্তার শেষ রেশটুকু রেখে যেতে পারেননি। শুভনীলকে লেপটপ বন্ধ করে কিছু না লিখেই ফিরে যেতে হয় সেদিন। অপরাহ্নে হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন। তারপর আর নির্দিষ্টভাবে কিছু বলার মতো অবস্থায় ছিলেন না।

২০১২ সালে অশোকবাবু যখন পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছার কথা জানান তখন শারীরিক কারণে অশোকবাবুর চলাফেরার ক্ষমতা খুবই সীমিত। বাড়িতে একাই চলাফেরা করতে পারেন। বাড়ির বাইরে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া যান না। রাজ্যে তখন তৃণমূল কংগ্রেস দলের সরকার। একবছর আগে বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের একটানা সরকারের অবসান হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের শেষের কয়েক বছরের শাসনকালের কিছু সিদ্ধান্ত, পদক্ষেপ, অশোকবাবুকে খুবই ব্যথিত করে। কিন্তু তথাপি নির্বাচনে বামফ্রন্টের পরাজয়ে তিনি খুবই হতাশ বোধ করছিলেন, বিশেষত শারীরিক কারণে। ওঁর পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে কোনো রাজনৈতিক উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন শুধু বামনীতির বিরোধী নয়, অনেক

বামনীতির পক্ষের মানুষও তৎকালীন বাম নেতৃত্বের চিন্তাভাবনায় এবং বাম শাসনের শেষপর্বের কাজে অখুশি ছিলেন। কিন্তু বামপন্থার প্রতি আস্থা, বাধ্য করে অশোকবাবুকে কিছু উদ্যোগ নিতে, অন্তত দলমত নির্বিশেষে প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। এই প্রচেষ্টা শুধু রাজনীতির পরিমণ্ডলে নয়, সমাজে, শিক্ষায় সাংস্কৃতিক জগতে সবরকমের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে মানুষকে একত্র করা। এই চিন্তা থেকেই *আরেক রকম* পত্রিকার কথা ভাবা। অশোকবাবু সবসময়ই স্পষ্ট বক্তা, স্বাধীন চিন্তার মানুষ, ওঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস অটুট রেখেও উনি স্বাধীন চিন্তা করতে পারতেন। কোনো রাজনৈতিক দলের মুখপত্রে ওঁর লেখা নিয়মিত ছাপার সুযোগ ছিল না, ওঁর স্বতন্ত্র চিন্তার কারণেই। তাই বিকল্প নতুন পত্রিকার কথা ভাবা।

অশোকবাবু পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছার কথা একদিন আমাকে জানান। তারপর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য ওঁর বাড়িতে কয়েক জনকে ডাকা হয়। প্রথম দিন মিহির ভট্টাচার্য, মালিনী ভট্টাচার্য এবং আমি ছিলাম। পরে পৃথক পৃথক ভাবে তৃষিত রায়, অভিজিৎ চৌধুরী, অভিজিৎ মুখার্জি, ইমানুল হক এবং আরো অনেকের সঙ্গে আলোচনা করে পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তুতি আরম্ভ করেন।

যাদের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা এদের মধ্যে করোরই পত্রিকা প্রকাশনার ব্যাপারে কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। অশোকবাবু অবশ্য দীর্ঘদিন ইকনমিক ও পলিটিক্যাল উইকলি পত্রিকার সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত ছিলেন। মালিনী ভট্টাচার্য কিছুদিন ছোটোদের একটি পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। কিন্তু এই স্বল্প মেয়াদের অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই খুব সুখকর ছিল না। অভিজিৎ মুখার্জি (লামা) বিজ্ঞাপন সংস্থা চালান। এই ব্যাপারে ওঁর অভিজ্ঞতা পত্রিকার সূচনায় অনেক সহায়ক হয়েছে। এখনও এই সহায়তা চালিয়ে যাচ্ছেন। অভিজিৎ চৌধুরী প্রথম দিকে নিয়মিত সাহায্য এবং পরামর্শ দিতেন। সরকারি চাকরির জন্য কখনো সরাসরি কাগজে যুক্ত থাকেননি। অভিজিৎ চৌধুরীর পরামর্শে কুমার রানাকে সম্পাদকমণ্ডলীতে যুক্ত করা হয়। অভিজিৎ এবং কুমার কাগজের সূচনা থেকে, বিশেষত অশোকবাবুর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে কাগজের খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিতেন।

প্রাথমিক আলোচনায় স্থির হয় প্রথমে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হবে। এবং এই ট্রাস্টই হবে কাগজের মালিক। সরকারি সংস্থা আরএনআই-এর নিয়ম, যেকোনো কাগজকে দৈনিক, পাক্ষিক যাইহোক এর একজন মালিক থাকতে হবে। মালিক হবে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। অশোকবাবুর ইচ্ছা অনুসারে অশোক মিত্র, অশোকনাথ বসু, তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, তৃষিতানন্দ রায়, অভিজিৎ মুখার্জি এবং বর্তমান লেখককে নিয়ে ট্রাস্ট গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়। অশোকবাবুর বাড়িতেই প্রথম ট্রাস্টের সভায় অশোক মিত্রকে সম্পাদক করার সিদ্ধান্ত হয় এবং অশোকবাবুকে সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। মিহির ভট্টাচার্য ট্রাস্টের কাজে অব্যাহতি নিলে, অমিত রায়কে ট্রাস্টের সদস্য করা হয়।

শুরুতে মিহির ভট্টাচার্যই পত্রিকার বিষয়ে সবথেকে উৎসাহী মানুষ ছিলেন। তিনি এবং অশোকবাবু এঁরা দুজনেই ট্রাস্ট এবং পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন। মিহিরদা এবং মালিনীদি দীর্ঘদিন অশোক মিত্র এবং গৌরী মিত্রের পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। গৌরী মিত্র চলে যাওয়ার পর, ওঁরা দুজনেই নিয়মিত অশোকবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। আমৃত্যু বিভিন্ন সময়ে অশোকবাবু অসুস্থ হলে বিশেষত মিহিরদা খবর পাওয়া মাত্র বাড়িতে বা হাসপাতালে উপস্থিত হতেন। কলকাতায় সকলকে খবর দিতেন এবং দিল্লিতে অদিতি ঘোষ মেহতা, জয়তী ঘোষ, প্রভাত পট্টনায়ক এবং আরও অনেককে অসুখের খবর জানিয়ে রাখতেন।

প্রাথমিক আলোচনাপর্ব শেষ করে, অশোকবাবু সম্পাদকমণ্ডলী গঠন এবং কাগজ প্রকাশনার প্রস্তুতির দিকে নজর দিলেন। তিনি জানতেন, সম্পাদকের দায়িত্ব ওঁকেই নিতে হবে। এটাও বুঝতে পারছিলেন, তিনি একা সম্পাদক হয়ে কাগজ প্রকাশ করতে পারবেন না। বিশেষত স্বাস্থ্যের কারণে। প্রথমেই মনে মনে স্থির করলেন, কবি শঙ্খ ঘোষকে এই কাগজে সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য করে প্রস্তুতিপর্ব শুরু করবেন। সময়টা ২০১২ সালের মাঝামাঝি। তিনি একদিন সদলবলে শঙ্খবাবুর কাছে গিয়ে পত্রিকা প্রকাশনার বিষয়ে আলোচনার প্রস্তাব দিলেন। শঙ্খবাবু নিজে অশোকবাবুর বাড়ি গিয়ে আলোচনায় আগ্রহী ছিলেন। অশোকবাবু রাজি হননি কারণ তখন শঙ্খবাবুও অসুস্থ ছিলেন। প্রথম আলোচনাসভায় অশোকবাবু ছাড়া মিহিরদা, লামা, গৌরী চট্টোপাধ্যায়, কুমার রানা ও আমি উপস্থিত ছিলাম। সভায় স্থির হয় অশোক মিত্র সম্পাদক, আর সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হয় শঙ্খ ঘোষ, গৌরী চট্টোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, কৌশিক সেন এবং কুমার রানাকে নিয়ে। স্থির হয়, কাগজ হবে পাক্ষিক এবং প্রকাশিত হবে প্রতি মাসের ১ এবং ১৬ তারিখে। পত্রিকা সাহিত্যপত্রিকা হবে না। কোনো গল্প, কবিতা, নাটক পত্রিকায় ছাপা হবে না। সাহিত্য এবং অন্যান্য যেকোনো বিষয়ের পুস্তকের সমালোচনা ছাপা হবে। রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক, নাটক, সিনেমা, খেলাধুলার বিষয়ে প্রবন্ধ ছাপা হবে। লেখক খুঁজে বার করতে হবে জেলা বা অন্যান্য মফস্‌সল শহর থেকেও। কাগজের মূল দৃষ্টিভঙ্গি বামপন্থী হলেও কাগজে উগ্র ধর্মান্ধতা

এবং হিংসার রাজনীতি ছাড়া অন্য যেকোনো অভিমত ছাপা হতে পারে। লেখার বিচার্য বিষয় ভাষা এবং বিষয়বস্তুর নিজস্বতা। প্রথমে দুটি সম্পাদকীয় এবং এরপর তিনটি সমসাময়িক বিষয়ে প্রবন্ধ ছাপা হবে। প্রথম পাঁচটি লেখায় লেখকের নাম থাকবে না। প্রতিটি লেখাই যেন পাঠককে ভাবায়, চিন্তার খোরাক হয়। ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের নিজের নামে কাগজের উদ্দেশ্য এবং অভিমুখ ব্যাখ্যা করে প্রবন্ধ ছাপা হয়। আজকের পাঠক যাঁরা তখন কাগজ পড়েননি তাঁরা এই সংখ্যায়, সম্পাদক এবং সম্পাদকমণ্ডলী সদস্যদের লেখা পড়লে অবশ্যই জানবেন, ৮৫ বছরের একজন বৃদ্ধ কী পরিমাণ প্রত্যাশা নিয়ে কাগজের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং শঙ্খবাবুর মতো একজন প্রবীণ মানুষকে এই কাজে উৎসাহিত করে যুক্ত করেছিলেন। প্রথম দিনের সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় স্থির হয়, কোনো অনুবাদ করা প্রবন্ধ পত্রিকায় ছাপা হবে না। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে অবাঙালি লেখকের প্রবন্ধ, উৎকর্ষ বিচার করে ছাপা হতে পারে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল কাগজের নাম স্থির করা। অশোকবাবু প্রস্তাব করেন, পত্রিকার নাম 'অন্যরকম' করা হোক। লামা জানান, আরএনআই-এর নামের অনুমোদনের জন্য অন্তত তিনটি নাম প্রস্তাব করে পাঠাতে হবে। আর ওঁরা পরীক্ষা করে দেখবেন এই নাম বা এই নামের কাছাকাছি কোনো নাম না থাকলে তবেই ওঁরা আমাদের প্রস্তাবিত নামের অনুমোদন দেবেন। লামা দায়িত্ব নিয়ে আরএনআই-এর ফর্মে প্রাসঙ্গিক নথিপত্র দিয়ে কাগজের মালিক অর্থাৎ সমাজচর্চা ট্রাস্টের পক্ষে অশোক মিত্র-র স্বাক্ষর-করা আবেদনপত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। কিছুদিন পর জানা যায়, 'অন্যরকম' নামের অনুমোদন পাওয়া যাবে না। এই নামের কাছাকাছি নামে কাগজ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমে শঙ্খবাবুকে এই খবর জানানো হয়, তিনি 'অন্যরকম'-এর কাছাকাছি *আরেক রকম* নাম প্রস্তাব করেন। অশোকবাবু রাজি হন। আরএনআই *আরেক রকম* নামে সম্মতি দেয়।

এর নামলিপি তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। হিরণ মিত্র অনেকেরই পরিচিত শিল্পী, মিহিরদা হিরণ মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে নামলিপির কয়েকটি নকশা আনেন। বর্তমানে চালু নামলিপি তখনই নির্বাচন করা হয়। কাগজ বর্তমানে যেখানে ছাপা হয়, ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কাগজ ছাপার দায়িত্ব এস. পি. কমিউনিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেডকে দেওয়া হয়। বাণিজ্যিক দিক, প্রেস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে নির্ধারণ করা হয়। কাগজ এখন ৬ বছর অতিক্রম করে ৭ বছরে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু অনেক ভুলত্রুটি সত্ত্বেও, কাগজের প্রতিটি সংখ্যা মাসের ১ এবং ১৬ তারিখে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। এর কৃতিত্ব অবশ্যই ছাপাখানার কর্মীদেরও প্রাপ্য।

কাগজ চালাবার জন্য প্রয়োজন একটি অফিস, অফিস চালানোর সরঞ্জাম, ছাপার খরচ, ডাকখরচ, অন্তত এক-দুজন অফিসকর্মী। আনুমানিক মাসিক খরচ ৭৫ হাজার টাকা। ২০ টাকা দামে কাগজ বিক্রি করে বিক্রেতাকে কমিশন দিয়ে কাগজ বিক্রি করে বাড়তি লাভ হয় না।

বিজ্ঞাপন পাওয়া গেলে, তার থেকে কাগজ চালাবার কিছু খরচ উঠতে পারে। পত্রিকা প্রকাশের শুরু থেকে একজন কর্মচারী, একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারীর সহায়তায়, বিনা ভাড়ার অফিস থেকে, নিয়মিত কাগজ চালানো সম্ভব হচ্ছে। পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার সময় এই দুইজন মানুষ অনেক প্রতিবন্ধকতা মুখ বুজে সহ্য করে কাগজ নিয়মিত পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে চলেছেন। পত্রিকার খরচ চালাবার জন্য অশোকবাবুর আশা ছিল, পত্রিকার শুভানুধ্যায়ী এবং ওঁর নিজের পরিচিত বন্ধুদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা সংগ্রহ করে, ওই টাকা ব্যাঙ্কে জমা রেখে, এর আয় থেকে কাগজ চালাবার কিছু খরচ মেটানো সম্ভব হবে। তিনি সমাজচর্চা ট্রাস্টের আজীবন সদস্য হওয়ার জন্য দেশের পরিচিত বাঙালি, অবাঙালি বন্ধু, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদদের কাছে আবেদন জানান। অনেকেই সাড়া দিয়ে টাকা পাঠিয়েছিলেন। এইভাবে কিছু টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। কয়েক জন ডাক্তার শুভাকাঙ্ক্ষী এবং আরো পরিচিত কয়েকজন-এর সহায়তায় যে বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় এর মাধ্যমে কোনোক্রমে খরচ চালানো সম্ভব হয়।

পত্রিকা ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাগজ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে গ্রাহক এবং পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। এই কাজে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাওয়া যায় ইমানুল-এর কাছ থেকে। রবিন মজুমদারের নিষ্ঠা এবং একাগ্রতায় বাকি কাজ প্রতিনিয়ত করা সম্ভব হয়।

প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন করে ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে নিয়মিত কাগজ প্রকাশিত হচ্ছে— এই ব্যাপারে সকলেই অবহিত। প্রথম কয়েকটি সংখ্যায় সম্পাদক অশোক মিত্র এবং সম্পাদকমণ্ডলীর কয়েকজন সদস্য প্রেসে উপস্থিত থেকে শুধু প্রুফ দেখে কাগজ নির্ভুল ছাপার ব্যবস্থা করাই নয়, কাগজের নান্দনিক দিক নিয়ে দীর্ঘ সময় ওঁরা ব্যয় করতেন। বিশেষ নজর দিতেন কাগজের মান, প্রতিটি প্রবন্ধের বিন্যাস, পরবর্তী প্রবন্ধ নতুন পাতায় আরম্ভ করা, প্রবন্ধের শেষে থাকা ফাঁকা অংশে শিল্পীর আঁকা ছবি। পত্রিকার মলাট থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কোনো ফটো ছাপা বারণ ছিল। একমাত্র ব্যতিক্রম করা হয় অশোকবাবুর মৃত্যুর পর

১৬ মে, ২০১৮ সংখ্যায়। শঙ্খবাবু এবং অশোকবাবুর সুনির্দিষ্ট মত ছিল, কাগজে লেখক পরিচিতি থাকবে না, পত্রিকার প্রচারের জন্য কোনো প্রচারপত্র প্রকাশ করা হবে না, অন্য কোনো কাগজে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হবে না। কাগজ চালাতে হবে প্রকাশিত প্রবন্ধের মানের ওপর আস্থা রেখে। এই ব্যাপারে কোনো বিচ্যুতি কখনো করা হয়নি।

প্রথম কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর স্বাস্থ্যের কারণে অশোকবাবুর পক্ষে আর প্রেসে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এই অবস্থায় অশোকবাবুর অনুরোধে হাল ধরেন শঙ্খ ঘোষ। ২০১৩ সালের শেষ সংখ্যা পর্যন্ত শঙ্খ ঘোষ ছাপাখানায় প্রতি সংখ্যায় একাধিকবার উপস্থিত হয়ে, নির্ভুল ছাপার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে ছাপার নির্দেশ দিতেন। এই একবছর কাল কাগজের গুণমানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল অনেকাংশে শঙ্খবাবুর একার প্রচেষ্টায়। শঙ্খবাবু নিজে বলেছিলেন, এই একবছর সময়, ওঁর পক্ষে আর অন্য কোনো কাজে নজর দেওয়া সম্ভব হয়নি। অশোকবাবু বাড়িতে বসে, সকাল-বিকেল ফোন করে ওঁর পরিচিত লেখকদের কাছ থেকে লেখা আদায় করতেন। অশোকবাবু নিজের স্মৃতিশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে, দীর্ঘদিনের পরিচিতির বহর থেকে বহু নামি অনামি লেখকদের ফোনে কথা বলে বাড়িতে ডেকে এনে লেখায় উৎসাহিত করেছেন। কে সিনেমা বিষয়ে লিখবেন, কার কাছ থেকে শিল্পকলার ওপর ভালো লেখা পাওয়া যাবে, কে উচ্চাঙ্গ সংগীত বিশেষজ্ঞ, এরকম প্রত্যেকের কাছ থেকে লেখা জোগাড় করেছেন। অশোকবাবু কাগজের সবদিক নিজে নজর রাখতেন। অবশ্যই প্রতি সংখ্যায় অশোকবাবুর নিজের নামে বা অনামে লেখা, কাগজের অন্যতম আকর্ষণ ছিল। তাই কাগজের উৎকর্ষের দিক অনেকাংশে রক্ষা করা সম্ভব হলেও, অশোক মিত্র থাকা না-থাকার ফারাক কোনোভাবেই পূরণ করা সম্ভব নয়। অশোকবাবুর প্রয়াণের পর একবছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই একবছরে পাঠকের এবং লেখকদেরও অনেক প্রত্যাশা হয়তো অপূর্ণ থেকে গেছে। তবে এইটুকু বলা যায়, অশোকবাবু এবং শঙ্খবাবু পত্রিকার সূচনায় যে সমস্ত বিধিনিষেধ তৈরি করেছেন, সেসব রক্ষা করে, পাঠকের কিছু প্রত্যাশা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। পত্রিকা এখন অনেকটা নিজের পরিচয়েও চলতে পারছে।

শঙ্খবাবু নিজে অশোকবাবুকে জানিয়েছিলেন, কাগজের দ্বিতীয় বর্ষ থেকে কাগজের কোনো দায়িত্বে থাকা ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ *আরেক রকমের* মতো কাগজের সম্পাদনার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষে দায়িত্বের কাজ প্রায় সর্বক্ষণের কাজ। ১ জানুয়ারি ২০১৪ থেকে এই কাগজের সম্পাদকমণ্ডলীতে যুক্ত না-থাকলেও এই কাগজের একজন হিতৈষী শঙ্খ ঘোষ সবসময়েই আছেন। সম্পাদকমণ্ডলীর কয়েক জন সদস্য বিবিধ কারণে নিয়মিত ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। সরাসরি কাগজের সঙ্গে আর যুক্ত না থাকলেও, অশোকবাবুর বর্তমানে এবং অবর্তমানে *আরেক রকম*-এর সঙ্গে যুক্ত প্রায় সকলেই শঙ্খবাবুকে অভিভাবকসম শ্রদ্ধা করেন।

শঙ্খ ঘোষের পর, অশোকবাবু কালীকৃষ্ণ গুহকে সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে রাজি করান। যদিও কালীকৃষ্ণবাবু *আরেক রকম* কাগজের সঙ্গে এর আগে কখনো কোনোভাবে যুক্ত ছিলেন না। কালীকৃষ্ণবাবুকে অশোক মিত্র মূলত কবি বলেই চিনতেন, যদিও কালীকৃষ্ণ গুহ দীর্ঘদিন সরকারি আধিকারিক পদে বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করেছেন। মিহির ভট্টাচার্য সম্পাদকমণ্ডলীর দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর কালীকৃষ্ণবাবুর উদ্যোগেই নিত্যপ্রিয় ঘোষ সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগ দেন। কিন্তু শারীরিক কারণে বেশিদিন সম্পাদকমণ্ডলীর কাজে যুক্ত থাকেননি। কিন্তু নিত্যপ্রিয়বাবু সর্বদাই কাগজের ব্যাপারে যেকোনো কাজে উৎসাহী থাকেন। সম্পাদকমণ্ডলীতে প্রথম দিন থেকে কুমার রানা অত্যন্ত সক্রিয় থেকেছেন। শুধু সম্পাদকমণ্ডলীর কাজেই নয়, অশোকবাবুকে লেখার ব্যাপারে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে সহায়তা করেছেন। গ্রামবাংলার জনজাতির মানুষের ব্যাপারে কুমার রানার চিন্তাভাবনা খুবই গভীর। এই ব্যাপারে ওঁর অনুধাবন বিভিন্ন লেখায় বিশেষভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

কুমার রানার নিজের কাজের সূত্রেও বহু মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং বন্ধুত্ব আছে। ওঁদের অনেককেই কুমার *আরেক রকম*-এ লেখার কাজে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। কালীকৃষ্ণ গুহ সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেও সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত থেকে কাগজ ঠিক সময়ে প্রকাশ করার কাজে প্রতি সংখ্যায় নিজের বাড়িতে এবং ছাপাখানায় উপস্থিত থেকে বিভিন্ন কাজে সহায়তা করেন। কাগজে বহু চিত্রশিল্পীর শিল্পকর্ম, প্রতি সংখ্যায় প্রচ্ছদে এবং ভিতরের পাতায় ছাপা হয় মূলত কালীকৃষ্ণবাবুর উৎসাহে এবং প্রচেষ্টায়। তা ছাড়া তিনি শুরু করেন পুনঃপাঠ অধ্যায়টি যেখানে বহু মূল্যবান লেখার পুনর্মুদ্রণ থাকে।

সম্পাদকের দায়িত্ব নেওয়ার পর, কুমার রানার নিজের কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও কাগজের উৎকর্ষের দিকে বিশেষ নজর ছিল। অশোকবাবুর সঙ্গে কাগজের ব্যাপারে দৈনন্দিন যোগাযোগের ফলে, অশোকবাবু নিজেও অনেক বেশি প্রতিটি সংখ্যার ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পেতেন। কুমারকে ছুটি নিয়ে নিজস্ব কাজে বিদেশ চলে যেতে হয়। কথা ছিল বিদেশ থেকে ফিরে আবার সম্পাদকের দায়িত্ব নেবেন। কিন্তু দেশে ফেরার কিছুদিন পর কাগজে প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ ও মতামতের ব্যাপারে কুমার আপত্তি জানান। অশোকবাবু

কুমারকে নিজস্ব মত প্রকাশ করার কথা বলেন। কিন্তু কুমার রানা সিদ্ধান্ত নিয়ে *আরেক রকম*-এর কাজকর্ম থেকে অব্যাহতি নেন।

কুমার রানার অবর্তমানে আবার অশোকবাবুকেই সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে হয়। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও গৌরী চট্টোপাধ্যায় কাগজের সম্পাদক হতে রাজি হননি। শেষের প্রায় দুই বছর অশোকবাবু সম্পাদকমণ্ডলীকে অনেক সক্রিয় করে এই কাগজ চালানোর চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে সম্পাদকমণ্ডলীতে যুক্ত হয়েছেন প্রণব বিশ্বাস, ইমানুল হক, শুভনীল চৌধুরী এবং শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য। প্রণব বিশ্বাস ছাড়া অন্য সকলেই বয়সে নবীন। কুমার রানাকে সম্পাদক করে অশোকবাবু তরুণ এবং প্রবীণদের সংমিশ্রণে কাগজ চালাবার দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলেন।

কাগজ চালু হওয়ার পর থেকেই একটা নিয়ম চালু ছিল, কাগজ প্রকাশিত হওয়ার পরই যেকোনো দিন বিকেলে অশোকবাবুর বাড়িতে সম্পাদকমণ্ডলীর সভা হবে এবং এই সভায় বিশেষত সম্পাদকীয় এবং সমসাময়িক মিলিয়ে পাঁচটি লেখার বিষয় এবং লেখক নির্ধারণ করা। তারপর নতুন লেখা যা জমা আছে এবং অন্যান্য যেসব লেখকের লেখা পাওয়া যাবে সেসব থেকে বাছবিচার করে বাকি লেখার বিষয়ে আলোচনা করা। যদি লেখার আলোচনা হত পরে এর আগে খাওয়া হত ঘরে বানানো শিঙাড়া বা অন্য কোনো নোনতা, মিষ্টি এবং চা। অশোকবাবু চেষ্টা করতেন নিজের হাতে চা এবং মিষ্টি পরিবেশন করতে। শেষদিকে সক্ষম না হলে উপস্থিত কেউ সাহায্য করতেন। সভায় আলোচনা এবং চা-জলখাবার দুটোই খুব আকর্ষণীয় ছিল। শঙ্খবাবু যতদিন সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন চেষ্টা করতেন সভায় উপস্থিত থাকতে। সভার গুরুগম্ভীর পরিবেশে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন গৌরী চট্টোপাধ্যায়। তিনিই শুধু চা পান এবং তারপর আলোচনার সময়ও অশোকবাবুর সঙ্গে হালকা রসিকতা করতে পারতেন। অশোকবাবু ওঁকে খুবই পছন্দ করতেন ওঁর লেখার জন্য। প্রায় প্রতি সংখ্যায় সম্পাদকীয় বা সমসাময়িক বিভাগে গৌরী চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থাকত, বিশেষত আন্তর্জাতিক বিষয়ে। কখনো কখনো রাজনৈতিক বিষয়েও লিখতেন, তবে স্বনামে বিশেষ লিখেছেন বলে মনে পড়ে না।

একথা অনস্বীকার্য, শুধু সম্পাদকমণ্ডলীর প্রচেষ্টায় কাগজের উৎকর্ষ ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব নয়। নিয়মিত লেখকের তালিকায় যাঁরা শুরু থেকে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হবে অশোক মিত্রের। 'অমিত্রাক্ষর' নিয়মিত প্রতি সংখ্যায় দীর্ঘদিন প্রকাশিত হয়েছে, তারপর যতদূর মনে পড়ে অনিয়মিতভাবে লিখেছেন। কালীকৃষ্ণ গুহও যতদিন সম্পাদক ছিলেন 'আসা-যাওয়ার পথের ধারে' এই শিরোনামে একটি কলাম লেখেন। এখনও মাঝে মাঝে লেখেন। ওঁর লেখা পাঠকের কাছে খুবই সমাদৃত। এই মর্মে চিঠিও প্রকাশিত হয়। শিক্ষকতা এবং অন্যান্য কাজের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন মননশীল বাঙালি *আরেক রকম*-এ কখনো নিয়মিত আবার মাঝে মাঝে লিখেছেন। নামের তালিকা দীর্ঘ হবে তথাপি কিছু নামের উল্লেখ করে আমাদের শ্রদ্ধার কথা জানাতে পারি। বহু বিষয় নিয়ে এই কাগজে লিখেছেন সৌরীন ভট্টাচার্য, অমিয় দেব, পবিত্র সরকার, অমিয় বাগচী, যশোধরা বাগচী, নবনীতা দেবসেন, দেবেশ রায়, অশোক সেন, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, যশোধরা রায়চৌধুরী, মালিনী ভট্টাচার্য, মিহির ভট্টাচার্য, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, রুশতী সেন, সুভাষ ভট্টাচার্য, অরুণ সোম, সোমেশ্বর ভৌমিক, সুকান্ত চৌধুরী, সুপ্রিয়া চৌধুরী, সমর বাগচী, কামরুজ্জামান, মানসপ্রতীম দাস, তপস্যা ঘোষ এবং আরো অনেকে। বিদেশ থেকে আজিজুর রহমান খান, বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী, দিল্লির জয়তী ঘোষ, হীতেন ভায়া, অমিতাভ রায়, অর্ধেন্দু সেন আরো অনেকে। অশোকবাবুর কথায় হয়তো একবারই লিখেছেন, তবে এঁদের কারও কারও লেখা পাঠকের এখনও মনে আছে। উল্লেখ্য, প্রতিমা ঘোষ, অম্লান দাশগুপ্ত এমন কয়েক জন।

বিভিন্ন কারণে অতীতে যাঁরা লিখতেন এখন আর তাঁদের লেখা পাওয়া যায় না। কিছুটা যোগাযোগের অভাবে। সম্পাদকমণ্ডলী এই ব্যাপারে আরো তৎপর হলে, বিশেষত যাঁরা প্রবীণ তাঁদের কথা বর্তমান প্রজন্মকে জানাতে পারলে অবশ্যই ভালো হবে। পত্রিকা এগিয়ে যাবে প্রবীণ এবং নবীন লেখকদের লেখার সংমিশ্রণে।

সংখ্যালঘুর আকুতি

শেখর দাশ

২৩ মে ('১৯) হয়তো পরিষ্কার হয়ে যাবে ১৭তম লোকসভার ভোটছবি। বা, চলবে এম পি টানাটানি, যে দলগুলো নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেনি তারা দর কষাকষি করবে। দরে না-পোষালে ভোটপূর্ব-জোট ভেঙে অন্যজোটে গিয়ে ঢুকতে পারে কোনো কোনো দল। এই চরিত্রহীনতাই আজকের ভারতীয় গণতন্ত্রের চরিত্র। বলা বাহুল্য, সুস্থ গণতন্ত্রের পক্ষে এই চরিত্রহীনতা ভয়ংকর। তবু ভোট হবে যেমন প্রতিবার হয়। কিন্তু এবারের ভোট বোধহয় এক ভয়ংকর, এক চরম সিদ্ধান্তের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এই ভোটে ঠিক হবে ফ্যাসিবাদকে আপাতত ঠেকানো যাবে, নাকি সে তার অপূর্ণ কাজগুলো শেষ করার লাইসেন্স পাবে। আমরা জানি হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানি তথা ইউরোপে ষাট লাখ ইহুদি খুন হয়েছিলেন, ঘর ছেড়েছিলেন লক্ষ-কোটি মানুষ। জার্মানির আকাশ ভারী হয়ে উঠেছিল মানুষের মাংস পোড়ার গন্ধে। ২০১৯-এর ভোটে ফ্যাসিবাদীরা যদি আবার ভারতে ক্ষমতা দখল করে তাহলে এদেশেও জার্মানির মতো অবস্থা হবে। গত পাঁচ বছরে ভূমিকা তৈরি করেছে, ফিরলে আগামী পাঁচ বছরে আরএসএস গেস্টাপোরা নির্মাণ করবে উপসংহার। শোবার ঘরের নিশ্চিন্ত কোণ থেকে টেনে বের করে এনে পিটিয়ে মেরে ফেলবে হাজার হাজার আখলাককে।

একথা ভাবার কোনো কারণ নেই যে এদেশে আরএসএস বা ভাজপা-ই একমাত্র ফ্যাসিবাদী— একমাত্র সাম্প্রদায়িক। যদি ১৯৪৭-এর পর থেকেও দেখি, তাহলে দেখতে পাব কংগ্রেস-সহ অনেক দলের গায়েই সাম্প্রদায়িকতার ক্লেদ লেগে রয়েছে। ওই দলগুলো এই অস্ত্রটিকে ঢেকেঢুকে কৌশলের সঙ্গে কাজে লাগায়— সাম্প্রদায়িকতা বা দাঙ্গা তাদের প্রধান অস্ত্র নয়।— সার্বিকভাবে এদেশের আমজনতাকে কোনোদিনই পুরোপুরি রকমের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষী করে তোলা যায়নি। শয়তানের চক্রান্তে কিছু সংখ্যক লোকজন সাময়িকভাবে হয়তো হিংস্র হয়ে উঠেছে। ঘটিয়েছে ভয়ানক কিছু। তারপর আবার শান্ত হয়েছে চরাচর। ফলে এদেশের সংখ্যালঘুরা, বিশেষ করে মুসলিমরা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণির নাগরিকের জীবনযাপন করলেও বেঁচেবর্তে ছিলেন। কষ্টেসৃষ্টে তাঁদের জীবন-জীবিকা চলছিল। কিন্তু আরএসএস তথা ভাজপার কোনো রাখঢাক নেই। তাদের উদ্দেশ্য হিন্দুত্ববাদী তথা ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতবর্ষ। তার স্বার্থেই নয়া উদার অর্থনীতি এই ফ্যাসিবাদীদের ইন্ধন জোগাচ্ছে। ফলে ২০১৪-তে ভাজপা/আরএসএস কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দখলের পর থেকেই এদেশের মুসলিম সমাজ অস্তিত্বের সংকটের মুখোমুখি। জার্মানির ইহুদিদের মতোই তাঁরাও এদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় প্রহর গুনছেন। শুধু মুসলিমরাই নন, খ্রিস্টান বা দলিত এবং আদিবাসীরাও আরএসএস/ভাজপা-র হাতে কোণঠাসা। তাই সংখ্যালঘু, দলিত এবং আদিবাসীদের এই মুহূর্তের একমাত্র লক্ষ্য, আকুতি ওই গেস্টাপো বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া। তাঁরা এখন তাকিয়ে রয়েছেন কংগ্রেসের দিকে। শুধু কংগ্রেস নয় তাকিয়ে রয়েছেন আঞ্চলিক হেভিওয়েট দলগুলোর দিকেও।

আমরাও পরিস্থিতির দিকে একটু নজর দেব। যদিও বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যম এবং রোজকার খবরের কাগজে প্রতি মুহূর্তের ভোট-আপডেট পাওয়া যাচ্ছে তবুও এ লেখার স্বার্থে ওই পরিচিত খবরগুলোতেই একঝলক চোখ রাখব। ২০১৪-র মতো মোদী-ম্যানিয়া এখনও তৈরি হয়নি। পাঁচ বছর আগে দাঙ্গা-অস্ত্র ছাড়াও মোদীর হাতে ছিল গুজরাটের 'আশ্চর্য' উন্নয়ন তত্ত্ব এবং দুর্নীতিমুক্ত ভারতের প্রতিশ্রুতি। মিডিয়া মোদীর বি-টিমের ভূমিকা পালন করেছিল। তাদের লাগাতার প্রচার-তাণ্ডবে মানুষ মোদীকে বিশ্বাসও করেছিলেন। কিন্তু আজ ওই উন্নয়ন তত্ত্ব পুরোপুরি ফ্লপ। আর গত পাঁচ বছরের শুধুমাত্র প্রকাশিত দুর্নীতির চেহারাতেই ভারত জগৎসভায় একেবারে প্রথম সারিতে স্থান করে নিয়েছে। ফলে পুলওয়ামা কাণ্ডের আগে অনেকেই তো ভাজপা-র ভেঙে পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন। বিশেষ করে একের পর এক রাজ্য-বিধানসভা ভোটে ভাজপা-র ধরাশায়ী হওয়ার ঘটনা তেমনই এক প্রবণতা তৈরি করেছিল। কিন্তু পুলওয়ামার পর পরিস্থিতি

কিছুটা বদলেছে। অবশ্য ভাজপা ওই কাণ্ডের আগে থেকেই তাদের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল।

ভাজপা এবার বিশেষ জোর দিয়েছে গো-বলয়ের বাইরে। যেমন উত্তর-পূর্ব ভারতে। ওই অঞ্চলের সাতটা রাজ্যে মোট ২৫টা আসন, গত লোকসভা ভোটে ভাজপা ৮টা পেয়েছিল। ২০১৪-র পর পরিস্থিতি বদলেছে। সাত বোনের মধ্যে সবথেকে বড়ো আসামের বিধানসভা ভাজপা দখল করেছে। শুধু আসাম নয়, মিজোরাম বাদে ওই অঞ্চলের সব ক-টা রাজ্যই আদতে ভাজপা-র দখলে চলে গেছে। অমিত শাহ হুংকার দিয়েছেন আগামী ভোটে ২৫টার মধ্যে তার ২১টা আসনই চায়। ওই আবদার মিটবে কিনা সেকথা বলবে ভবিষ্যৎ, কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারতে এবারে অ্যাডভান্টেজ ভাজপা। আবার সাম্প্রতিক বিধানসভা ভোটের ফলাফলগুলোকে মাপকাঠি ধরলে গো-বলয়ে বা হিন্দিভাষী এলাকায় কংগ্রেস কিছুটা সুবিধেজনক জায়গায় রয়েছে। রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশের বিধানসভায় তারা ক্ষমতা দখল করেছে। গত লোকসভা ভোটে ওই দুই রাজ্যের ৫৪টা আসনের মধ্যে ৫২টাই পেয়েছিল ভাজপা। কিন্তু বিধানসভা-ভোট-প্রবণতা বজায় থাকলে ওই দুই রাজ্য এবারে কংগ্রেসের মুখে হাসি ফোটাবে। উত্তরপ্রদেশে গতবার ৮০টির মধ্যে ৭১টা দখল নিয়েছিল মোদী-শাহ্-র ভাজপা। এবার তারা নিজেরাও ওই ফল আশা করছে না। সেখানে সমাজবাদী-বিএসপি-র ভোট তাদের আসন কমাবে। বিহারে ভাজপা-র এনডিএ ২০১৪-তে ৪০টার মধ্যে ২২টা পেয়েছিল, ছত্তিশগড়ে পেয়েছিল ১১-তে ১০। সম্প্রতি কংগ্রেস ছত্তিশগড় বিধানসভা কংগ্রেস দখল করেছে— ফলে এবারের লোকসভায় ওখানে ফেভারিট তারাই। গত লোকসভা ভোটে গুজরাটে ২৬টি আসনের সব ক-টিই দখল করেছিল ভাজপা। কিন্তু হার্দিক প্যাটেল আর জিগ্নেশ মেবানিকে পাশে নিয়ে বিধানসভা ভোটে কংগ্রেস পাশা প্রায় উলটে দিয়েছিল। মোদী-রাজ্যে লোকসভা ভোটে তাদের সম্ভাবনা আশাব্যাঞ্জক। গত লোকসভা ভোটে মহারাষ্ট্রে শিবসেনা-ভাজপা জোট ৪৮টার মধ্যে ৪১টা আসন পেয়েছিল। সম্প্রতি কৃষকদের আন্দোলনের কারণে সারা দেশের সঙ্গে সঙ্গে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিও বেশ সরগরম। কংগ্রেস-এনসিপি আশা করছে তারাই কৃষকদের আশীর্বাদ পাবে। হরিয়ানাতে '১৪-র ভোটে ভাজপা ১০টা আসনের মধ্যে ৬টা পেয়েছিল— কিন্তু সেখানেও হাওয়া ঘুরতে শুরু করেছে— লোকসভায় কংগ্রেস এবারে ভালো ফল আশা করতেই পারে। বস্তুত, গত লোকসভা ভোটে গুজরাট মহারাষ্ট্র সমেত হিন্দি তথা গো-বলয়েই ভাজপা দু-শোরও বেশি আসন পেয়েছিল। এবারে সেই সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে। সেই ক্ষতি তারা পূব আর দক্ষিণে পূরণ করে নিতে চাইছে। যদিও গত লোকসভা ভোটে দক্ষিণের রাজ্যগুলোর মধ্যে একমাত্র কর্নাটকেই ভাজপা একটু বেশি আসন পেয়েছিল। কিন্তু বিধানসভা ভোটের পর কংগ্রেস জেডি(এস)-কে সমর্থন করে ভাজপা-র বাড়া-ভাতে-ছাই ঢেলে দিয়েছে। ভারতীয় রাজনীতিতে এমন ঘটনা আখছারই ঘটে। তবুও ওই রাজ্যে ক্ষমতার বৃত্তে থাকার সুবিধা কংগ্রেস কতটা ভোটে রূপান্তরিত করতে পারবে সে ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছেই, কারণ ভাজপা সেখানে ট্র্যাজিক হিরোর সহানুভূতিটা পাচ্ছে। কর্নাটক ছাড়া অন্যান্য দক্ষিণী রাজ্যগুলোতে ভাজপা-র সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল নয়, কংগ্রেসেরও সেখানে ছোটোভাইয়ের দশা। তামিলনাড়ুতে ভাজপা সঙ্গী জয়ললিতা '১৪-র ভোটে বিরোধীপক্ষকে মুছে দিয়েছিল। কিন্তু তার প্রয়াণের পর অন্তর্দ্বন্দ্বে জেরবার এআইএডিএমকে ভাজপাকে এবার খুব একটা আশা দেখাতে পারছে না। আবার ভাগে বেশি আসন পেলেও কংগ্রেসকে সেখানে বেশি ভোট পেতে ডিএমকে-প্রধান স্ট্যালিনের সাফল্যের ওপরই নির্ভর করতে হবে। অন্ধ্রপ্রদেশের প্রধান দল টিডিপি সদ্য ভাজপা-র সঙ্গ ছেড়েছে। ওখানে কংগ্রেস হয়তো টিডিপি এবং ওয়াইএসআর কংগ্রেসের পেছনে তৃতীয় স্থানের জন্য লড়বে। তেলেঙ্গানায় এখনও পর্যন্ত চন্দ্রশেখর রাও-এর দোর্দণ্ড প্রতাপ। জোট না হলেও তার ঝোঁক ভাজপা-র দিকেই, মুছে যাওয়া কংগ্রেস সেখানে মাটি খুঁজছে। বড়ো রাজ্যগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র কেরালা এবং ওড়িশা ২০১৪-র ভোটে ভাজপা-কে শূন্য হাতে ফিরিয়েছিল। কেরালাতে এবারও সেরকম ফলেরই সম্ভাবনা। বরং ক্ষমতাসীন বাম জোটের সঙ্গে এবার সেখানে কংগ্রেস-জোটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। ওড়িশার ২১টি আসনের সব ক-টিই পেয়েছিল নবীন পট্টনায়কের বিজেডি। এবারের ভোটে খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে এই ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের ফলাফল। এ রাজ্যে বামফ্রন্টকে সঙ্গী করে কংগ্রেস যে কতদূর এগোবে সে ব্যাপারে সকলেরই সন্দেহ রয়েছে। বরং ভাজপা ভালো ফলের আশা করছে, এখানে তারা সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়েছে। যদিও গতবারের দুটো আসনকে ২২টা করার হাস্যকর খোয়াব সত্যি হবে না! তৃণমূল কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত তাদের ভোট প্রায় সবটাই ধরে রাখতে পেরেছে, তাদের আসন বিশেষ কমবে বলে মনে হয় না।

অতএব আমরা বলতে পারি, গত পাঁচ বছরের বিভিন্ন বিধানসভার নির্বাচন এবং উপনির্বাচনগুলোর প্রবণতা বজায় থাকলে এবারের লোকসভায় ভাজপা তথা এনডিএ জোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কংগ্রেস জোটেরও সেই সম্ভাবনা তৈরি হয়নি। ফলে জোটের বাইরে থাকা দলগুলোই পরবর্তী কেন্দ্র-সরকার গঠনে এবার খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে। সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও দলিতেরা ওই দলগুলোর দিকে

তাকিয়েই বুক বাঁধছেন। বুক বাঁধছেন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শান্তিপ্রিয় মানুষ। ওই দলগুলোর মধ্যে তেলেঙ্গানার চন্দ্রশেখর রাও সম্ভবত ভাজপা-কেই সমর্থন করবেন। বাকিদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী-বিএসপি জোট ভাজপা-র বিরুদ্ধেই জোট বেঁধেছে, অসহায় মানুষগুলো আশা করছেন ভোটের পরে তারা ভাজপাবিরোধী সরকার গঠনের চেষ্টা করবে। বিজেডি এখনও পর্যন্ত একলা চলছে— সংখ্যালঘুরা ভীষণভাবে আশা করছেন নবীন পট্টনায়কের শুভবুদ্ধির উদয় হবে। এনডিএ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে অন্ধ্রের টিডিপি— বিপন্ন মানুষেরা এই দলটিকে আগামী দিনে বিরোধী জোটের সরকারে দেখতে চাইছেন। আর রয়েছে পশ্চিমবাংলার তৃণমূল কংগ্রেস— এই দলটিই সবথেকে জোর গলায় এখনও পর্যন্ত মোদী তথা ভাজপা-র বিরোধিতা করছে। সংখ্যালঘু মানুষেরা ওই জোরালো কণ্ঠের ওপর ভরসা রাখতে চাইছেন।

অথচ ইতিহাসের ট্রাজেডি এই যে ওই ভরসার দলগুলোর প্রায় সকলেরই একসময় ভাজপা-র সঙ্গে দোস্তি ছিল। একমাত্র সমাজবাদী পার্টি কোনোদিন সরাসরি ভাজপা-র সঙ্গে আঁতাতে যায়নি। কিন্তু সমাজবাদীর জোটসঙ্গী মায়াবতী একাধিকবার ভাজপা-কে সঙ্গে নিয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন; অন্ধ্রপ্রদেশের ভোটে খারাপ হতে পারে এই আশঙ্কায় টিডিপি তো এই সেদিন ভাজপা-র সঙ্গ ত্যাগ করল; ওড়িশার বিজেডি প্রায় দশ বছর বিজেপি-র জোটসঙ্গী ছিল; আর অটলবিহারী বাজপেয়ির ভাজপা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ রেলমন্ত্রী ছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়! এইরকম এক ট্রাজেডির ঋতুতে সংখ্যালঘু মানুষদের ভরসার জায়গা হয়ে উঠতে পারত বামপন্থী দলগুলো। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য এই দেশের যে, বাম দলগুলোই আজ এখানে অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে! তাই সংখ্যালঘুরা ওইসব আঞ্চলিক দলগুলোর শুভবোধের ওপরই ভরসা রাখছেন— তারা ভাবছেন অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনে তারা সত্যিকারের ফ্যাসিবিরোধী হয়ে উঠবে। তা যদি হয়, তাহলে এদেশের কোটি কোটি সংখ্যালঘু মানুষকে বাপ-পিতামহ-চোদ্দোপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে উদ্‌বাস্তু হতে হবে না। এদেশের আকাশ-বাতাস মানুষের মাংস পোড়ার গন্ধে ভারী হয়ে উঠবে না।

ভারতবর্ষেও যে-ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে এ-ইতিহাসের শেষ তাৎপর্য এ নয় যে, এ দেশে হিন্দুই বড়ো হইবে বা আর কেহ বড়ো হইবে। ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতায় মূর্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে—ইহা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই। এই পরিপূর্ণতার প্রতিমা গঠনে হিন্দু মুসলমান বা ইংরেজ যদি নিজের বর্তমান বিশেষ আকারটিকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহাতে স্বাজাতিক অভিমানের অপমৃত্যু ঘটিতে পারে, কিন্তু সত্যের বা মঙ্গলের অপচয় হয় না।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গুটিয়ে গেল জেট-এর ডানা

অমিতাভ রায়

বৈশাখের এই তপ্ত হাওয়ায় হঠাৎ করে ছড়িয়ে পড়ল আগুনের রং। হলুদ পোশাকের এই বাহিনী কোনো উৎসব করতে দিল্লির যন্তরমন্তরে সমবেত হয়নি। তাঁদের মুখে কোনো ভাষা নেই। উচ্চকিত ভাষণ অনুচ্চারিত। হাতে রয়েছে ছোটো ছোটো প্ল্যাকার্ড। আর সকলের চোখে জল। আনন্দাশ্রু নয়। সদ্য উপার্জন হারিয়ে যাওয়ার দুঃখ-যন্ত্রণায় সকলেই ক্রন্দনরত।

দিল্লির যন্তরমন্তরে তো প্রায় প্রতিদিনই কোনো-না-কোনো বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। নানান রকমের পতাকা-ফেস্টুন নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মানুষ নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে স্লোগান দেয়। বিভিন্ন ভাষায় ভেসে আসে বক্তাদের জ্বালাময়ী ভাষণ। কিন্তু উনিশে এপ্রিলের এই ব্যতিক্রমী সমাবেশে কোনো শব্দ নেই। ভরদুপুরে ঘন্টা দুয়েক ধরে চোখের জলে তাঁরা বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন দেশের বিমান পরিবহণ ব্যবস্থায় গভীর দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে।

এঁদের কেউ বিমানবন্দরে মাল ওঠানো-নামানোর কাজে যুক্ত, কেউ আবার পাইলট, বিমানসেবিকা। দু-তিন মাস ধরে বেতন না-পেলেও তাঁরা নিয়মিত কাজে আসছিলেন। এক নির্দেশেই তাঁদের সকলেরই পরিচয় হয়ে গেল— ঝাঁপ বন্ধ করা জেট এয়ারওয়েজের কর্মী। হাতের প্ল্যাকার্ডে লেখা— জেট বাঁচান। আমাদের পরিবার বাঁচান; আমাদের কাজ করতে দাও/ আমাদের কাজ ফিরিয়ে দাও। অভিযোগ উঠল, সরকার কিছুই করেনি। এই অবস্থায় কেন্দ্রের প্রতি জেটের কর্মী সংগঠনের আর্জি, অবিলম্বে সরকার হস্তক্ষেপ করুন।

আঠারো এপ্রিল রাত বারোটা থেকে জেট এয়ারওয়েজ সমস্ত রকমের পরিষেবা বন্ধ করে দেয়। তার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই দিল্লিতে উপস্থিত জেট এয়ারওয়েজের সমস্ত কর্মী একজোট হয়ে নিজের নিজের পেশাগত পোশাক পরে নীরবে কাজ ফেরানোর দাবি জানালেন। যন্তরমন্তরের সমাবেশস্থলে জেট এয়ারওয়েজের নিজস্ব হলদে রঙের পোশাকে ঝলকে উঠলেও আসলে তা ছিল কাজ হারানোর যন্ত্রণা সম্পৃক্ত ক্রোধের আগুনের বহিঃপ্রকাশ।

উনিশশো নব্বইয়ের দশকে ভারতে বাজার অর্থনীতির সূচনালগ্নে ডানা মেলেছিল স্বপ্নের উড়ান জেট এয়ারওয়েজ। স্বপ্নের উড়ান যাত্রার প্রতিশ্রুতি আর 'দ্য জয় অব ফ্লাইং' স্লোগান দিয়ে আড়াই দশক আগে ডানা মেলেছিল জেট এয়ারওয়েজ। শুরুতে ঘরোয়া উড়ানের পরে চালু হয় আন্তর্জাতিক পরিষেবা। কিন্তু পুঁজির অভাবে আঠারো এপ্রিল বুধবার গুটিয়ে ফেলতে হল সেই ডানাই। সংস্থার বয়ানে, সাময়িকভাবে জেট-এর সমস্ত পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হল। সবমিলিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় বিশ হাজারেরও বেশি পরিবার। দামানিয়া, মোদিলুফৎ, সহারা, এয়ার ডেকান, কিংফিশার-এর মতো পরিচিত বিমান সংস্থা নিয়ে গত পাঁচ বছরে দেশে অন্তত সাতটি বেসরকারি বিমান সংস্থা পরিষেবা গুটিয়েছে। তারও আগে পরিষেবা বন্ধ করেছে আরও কয়েকটি। সেই তালিকায় এখন যুক্ত হল জেট।

ঝাঁপ নামানোর মুহূর্তে জেটের ঘাড়ে সাড়ে আট হাজার কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ঋণের বোঝা। সেইসঙ্গে কর্মীদের অন্তত তিন মাসের বকেয়া বেতন। ফেরত দিতে হবে বাতিল যাওয়া উড়ানগুলির টিকিটের দামও। নতুন করে পুঁজি না ঢাললে এর পরে জেটের চাকা কোন পথে গড়াবে বা আদৌ গড়াবে কিনা বলা বেশ কঠিন।

জ্বালানির দাম সমেত পারিপার্শ্বিক পরিষেবার খরচ সব সংস্থারই বাড়ছে। প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার জন্যে অন্যান্য অনেক বিষয়ে যেমন বেতন-বোনাস ইত্যাদিতে সমঝোতা করলেও যাত্রী পরিষেবায় পান থেকে চুন খসলেই মুশকিল। বিশেষত আন্তর্জাতিক উড়ানের পরিষেবার মান বজায় রাখতে গিয়েই জেট জেরবার। সংস্থার আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করে যখন আন্তর্জাতিক উড়ানে নিয়ন্ত্রণ আনা দরকার ছিল, জেট তা করেনি। বরং লাগামছাড়া হয়ে বাড়িয়ে গেছে, পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হয়েও ভারত সরকারের বিমান মন্ত্রক নীরব থেকেছে। কোনো লাগাম টানার প্রয়াস দেখা যায়নি। সেই সুবাদেই জেটের কোষাগারে টানাটানির সূচনা। তেল সংস্থাগুলির টাকা বাকি রাখা হয়ে গেল নিয়মিত ব্যাপার।

ঋণদাতাদের দেনা শোধ হচ্ছে না। সেইসঙ্গে বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে নেওয়া বিমানের ভাড়াও বকেয়া। কর্মীদের বেতনও অনিয়মিত। টাকা বাকি থাকায় একাধিকবার জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয় তেল সংস্থাগুলি। এভাবেই ক্রমশ পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছিল। ফলে আশঙ্কা বাড়ছিল।

শেষপর্যন্ত গত মার্চ মাসে মাত্র এক টাকার বিনিময়ে জেটের মালিকানার একান্ন শতাংশ অংশীদারি হাতে নেয় স্টেট ব্যাঙ্কের নেতৃত্বাধীন ঋণদাতাদের গোষ্ঠী। সিদ্ধান্ত হয়, জেটের বর্তমান চেয়ারম্যান পদ ছেড়ে দেবেন। কমে যাবে তাঁর অংশীদারি। আরেক বড়ো অংশীদার যারা আদতে বিদেশি বিমান সংস্থা, তাদেরও শেয়ার কমবে। শুরু হয় ঋণদাতাদের হাতে থাকা অংশীদারির নিলাম প্রক্রিয়া। পাশাপাশি কথা ছিল, আপাতত পরিষেবা চালাতে দেড় হাজার কোটি টাকা দেবে ব্যাঙ্ক। কিন্তু সেই টাকাও শেষপর্যন্ত মেলেনি। আপৎকালীন পুঁজি হিসেবে ব্যাঙ্কের কাছে চারশো কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল। সাম্প্রতিক অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্যে ঋণদাতারা আর নতুন করে হাত পোড়াতে রাজি না হওয়ায় সেই আর্জি খারিজ হয়ে যায়। ফলে আপাতত পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া জেটের সামনে আর কোনো পথ খোলা ছিল না। অংশীদারি হাতবদলের সময়ে কর্মীদের ভবিষ্যৎ কী হবে, সেই প্রশ্নের উত্তরও অজানা।

বিদায়ী সরকার ছোটো শহরগুলির মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে বিমানবন্দর ও পরিকাঠামো তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছিল। এই অবস্থায় জেটের মতো একটি সংস্থার এক দিনের জন্য ডানা গোটানোও মোটেও ইতিবাচক ইঙ্গিত নয়। ঋণভারে জর্জরিত এবং ক্রমাগত লোকসানে চলতে থাকা সরকারি সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া এই দুর্দিনে জেটের দিকে হাত বাড়ানোর প্রাথমিক উদ্যোগ নিলেও ঋণদাতা ব্যাঙ্কগুলির সাবধানবার্তায় পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। বিমান মন্ত্রক অবশ্য বলেছে, সংস্থাকে ঘুরিয়ে দাঁড় করানোর পরিকল্পনায় সবরকম সাহায্য করবে কেন্দ্র।

এখানেই প্রশ্ন ওঠে জনসাধারণের করের টাকায় আবারও কি একটি ডুবে যাওয়া বেসরকারি সংস্থাকে বাঁচানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে? নির্বাচনের মরশুমে মন্ত্রীরা দলীয় প্রচারে ব্যস্ত। আমলা স্তরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঝুঁকি কে নেবেন? একটি বেসরকারি বিমান সংস্থা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। জেটের শত খানেক পাইলটকে সংস্থাটি সাময়িকভাবে কাজে লাগাবে। অন্যান্য কাজেও চার-শোর মতো জেট কর্মী সাময়িকভাবে কাজ পাবেন। জেটের বসে যাওয়া বিমানগুলির কয়েকটিকে এয়ার ইন্ডিয়া ব্যবহার করবে। সামান্য এবং সাময়িক হলেও এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তবে একটি বিমান সংস্থার নিয়মিত পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য অনুসারী পরিষেবা-ব্যবস্থার অবস্থা কী হবে? ট্রাভেল এজেন্ট থেকে শুরু করে বিমানবন্দরে কাজ করা ঠিকা কর্মীদের ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত।

একইরকমভাবে অনিশ্চিত সরকারি সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়ার ভবিষ্যৎ। লোকসানে চলা দেনার দায়ে ঝুঁকে পড়া এয়ার ইন্ডিয়া বেচে দেওয়ার জন্যে বর্তমান শাসকগোষ্ঠী অনেকদিন ধরেই অঙ্গীকারবদ্ধ। অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিএসএনএল, এমটিএনএল, হ্যাল থেকে শুরু করে মুনাফা অর্জনকারী বিইএমএল পর্যন্ত এখন সকলেই বিকিয়ে যাওয়ার জন্যে তৈরি। বেসরকারিকরণের এই মরশুমে বিশেষত নির্বাচনী প্রচারের আলোড়নের মধ্যেই পাঁচটি বিমানবন্দরের পরিচালনা ব্যবস্থার দায়িত্ব পেয়ে গেল এক বিতর্কিত সংস্থা। দেশের তেরোটি প্রধান নৌ-বন্দরের প্রায় সব ক-টির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তারা আগেই পেয়েছিল। ভারতের একমাত্র বেসরকারি নৌ-বন্দরও এই সংস্থারই মালিকানাধীন। দেশের ছাব্বিশটি ছোটো নৌ-বন্দরের পরিচালনায় এখন তারাই দায়িত্বপ্রাপ্ত। ডামাডোলের বাজারে পাঁচ পাঁচটি বিমানবন্দরও তাদের করায়ত্ত হল।

সপ্তদশ লোকসভা ভোটপর্ব শুরু হয়ে গেছে। মাস খানেক বাদে ফল প্রকাশ হবে। বর্তমান শাসকগোষ্ঠী আবার ক্ষমতাসীন হলে দেশের গণতন্ত্র বিপন্ন হবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সাম্প্রদায়িক হানাহানি আরও বাড়বে। বেড়ে যাবে একটি নির্দিষ্ট ভাষাভাষী মানুষের দাপট। খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে পোশাক-পরিচ্ছদ এমনকী মানুষের চলাফেরা-মেলামেশায় আসবে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ। এবং একইসঙ্গে ভেঙে পড়বে দেশের অর্থনীতি। এই সামগ্রিক বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়— নিজের ভোট নিজে দিয়ে এই ভয়াবহ শক্তিকে বিদায় করতেই হবে।

‘নমো-বুলি’ বনাম ‘মনের কথা’

শ্রীদীপ

শাড়িতেও তাঁর মুখ, বিয়ের কার্ডেও তিনি— বুঝুন ব্যাপারখানা!

শাসকের মুখ যখন নামাবলীর মতো শরীর বা সংসারের এতটা কাছাকাছি চলে আসে, বা মানুষ যখন স্বেচ্ছায় সেই সংস্পর্শটা মেনে নেয়, তখন কাণ্ডজ্ঞান একেবারে গোল্লায় না গিয়ে থাকলে, মুখ দিয়ে আপনা থেকেই লালমোহনোচিত কায়দায় বেরিয়ে আসে, ‘হাইই-লি সাস-পি-সাস’!

নমো যে (উপ)ভোগ্য পণ্য হয়ে উঠবে, তা ২০১৪-র নির্বাচন প্রচারেই বোঝা গিয়েছিল। এতই ভক্তির জোয়ার এসেছিল যে নমো-মুখ(শ)-এ ঢেকে যাচ্ছিল ভক্ত-মুখ। মুখ(শ)-এর দাপটে মুছে যাচ্ছিল পাবলিকের আসল থোবড়া। আজ সে মুখ(শ) ও তার ডাকসাইটেপনা এতটাই মস্তানি করছে যে তাকে উপেক্ষা করে— কার এত বড়ো ৫৭ ইঞ্চির (৫৬ থেকে এক বেশি) বুকের পাটা?

কল্যাণময়ীর ন্যায় তিনি সর্বত্র— পেট্রোল পাম্পে, দৈনিক পত্রিকার প্রথম পাতায়, বিমানবন্দরে, বাস স্ট্যান্ডে, প্রেক্ষাগৃহে, জনপরিবহনের গোটা শরীর জুড়ে, গ্রামে-শহরের, রণে-বনে-জঙ্গলে— সর্বত্রই এক মুখোশ-রাজত্ব। মুখোশ-এর দেশে, আয়নায় মুখ দেখাবার জো নেই আর! খেতে-পাওয়া বা খেতে না-পাওয়া ভোটার বাছারা সবাই যেন মুখ-বিহীন বাকরুদ্ধ (জন)সংখ্যা— দৃশ্য-পূজায় মাতোয়ারা। প্রতিদিনই সাফল্যের (বা সাফল্যের দাবির) মহাসপ্তমী উদ্‌যাপিত হচ্ছে জনগণেরই টাকায়।

এক ঢাক-পেটানো-স্বভাব আমাদের শাসন করছে, দৃশ্য দ্বারা। সদা হাস্যোজ্জ্বল চিত্তে একটা মুখ(শ) মনে করিয়ে দিচ্ছে কার দয়া-দোয়া-দাক্ষিণ্যে আপনার হাঁড়িতে ভাত চড়ছে (বা চড়বে), ছ-কোটি গ্যাসের কানেকশন হয়েছে (বা হবে), বিদ্যুৎ আসছে (বা আসবে), সাফ হচ্ছে (বা হবে) নদী/পরিবেশ/পাড়া, সেচের জল আসছে (বা আসবে) প্রতি খেতে, ইত্যাদি আরো কত কী দাবি। ৫৬ ইঞ্চির ঔদ্ধত্যে গড়া এক মহাতারকার ইমেজ ঘন ঘন জানিয়ে যাচ্ছে ‘আচ্ছে দিন’ এই এল বলে— বিজ্ঞাপন বিরতির পরেই আসতে চলেছে আর কি। আপনার-আমার প্রযোজিত চার হাজার কোটি টাকার প্রচারের মধ্যে আছি— ‘মিত্রো...ও...ও’। এটা কোনো মনগড়া মনের কথা নয়— ডাহা সত্য।

দৃশ্য দ্বারা প্রতিনিয়ত আত্মপ্রচারের এই বিজ্ঞাপনী খেলার একটাই নিয়মাবলী— প্রচার, আরো প্রচার, আরো আরো বড়ো করে প্রচার। দৃশ্যের পেছনের আসল তথ্য পরিসংখ্যানগুলি অবিশ্যি আপনার নাগালের বাইরেই রাখা হয়েছে। ঝালিয়ে নিন সেই হীরক-সংলাপ: ‘এরা যতো জানে তত কম মানে’। তাই প্রচারে বিশ্বাস করুন। তাই নির্দ্বিধায় প্রগতির মিথ-এ ভরসা রাখুন। মুখোশে ভরসা রাখুন। আত্মতৃপ্তির ঘোরে থাকুন। ঘোর কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন কি দেশদ্রোহী— নমো-পূজারি থেকে সোজা নেমকহারাম। খামোখা প্রশ্ন করার বদভ্যেসগুলোকে কেন যে আশকারা দেন? বেয়াদব যত! বাপ্‌-মা শেখায়নি বড়োদের মুখে মুখে তর্ক না করতে? অনুশাসনে আস্থা রাখুন।

এই দৃশ্য-শাসন সম্মোহনের চেহারা নিয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যেই। হাজার হাজার ডক্টর হাজরা টর্চ নাচাচ্ছেন, আর আমরা নির্দ্বিধায় দুলে দুলে যা শুনছি তাই মানছি। বাধ্য ছেলের মতো আঁধারের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে চলেছি চোদ্দোপুরুষের চোদ্দো রকমের খুঁটিনাটি। অনায়াসে ভুলে যাচ্ছি ঘৃণ্য গণহত্যা ও গণ-ধর্ষণ— এমনই প্রকোপ গণ-অমনেশিয়ার। দেশের নামে দেশবাসী মেনে নিয়েছিল নোটবন্দির অযৌক্তিক নিত্যনতুন যুক্তি, এখন প্রমাণ ছাড়াই মেনে নিচ্ছে তিনশো জঙ্গির নিধননামা।

আরোপিত ছবিগুলোর সঙ্গে আসল ছবির তফাতটা ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে। অনুসন্ধান করার ইচ্ছেগুলো ছুটি নিয়েছে। বধির গণতন্ত্রের মহাকুম্ভ বসেছে নাম-পালটে-ফেলা কোনো শহরে। সেখানে মানুষ হুঁশ হারিয়ে নমো-বুলি জপছে, এমনই একনিষ্ঠ রাজভক্তি। সবার উপরে নমঃ সত্য, তাহার উপরে নাই— বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু, তর্কে বহু দূর।

যদিও ‘জানার কোনো শেষ নাই, জানার চেষ্টাও বৃথা তাই’,

তবুও জানতে ইচ্ছে করে—

মিগ্ বিমানের আস্ফালনে কৃষি আয় বাড়বে কি?

দেশাত্মবোধের বন্যায় ভেসে বেকার চাকরি পাবে তো?

অসহিষ্ণুতার চারাগাছ লাগানো মৌলবাদীদের ইতিহাস কত সহজে ভুলে যাবে?

প্রশ্ন করার অধিকার কেড়ে নিলেই ধামা-চাপা-দেওয়া সমস্যাগুলো দুষ্টু লোকটার মতো ভ্যানিশ করে যাবে কি?

বিরোধীকে দেশদ্রোহী সাব্যস্ত করলেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্ম-সংস্থানের রাতারাতি সুরাহা হবে তো?

প্রশ্নগুলো সহজ, আর উত্তরও তো জানা।

কীভাবে খুলবে এ মুখোশ? কে ছাড়াবে বাবাজির আঁশ? কে করবে রাজাকে উলঙ্গ? ভবানন্দের ভবের খেলা আর কদ্দিন? এ উত্তরগুলো অজানা হলেও, মোদ্দা কথা হচ্ছে, 'আচ্ছে দিন' যে নেই— প্রচার থাকলেও নেই, না থাকলেও নেই— সেটা নাগরিক বোঝে কি? নাকি মুখোশের সঙ্গে মুখের আর ফারাকই করে উঠতে পারছে না বুঁদ হয়ে থাকা মানুষ?

বৃহৎ ভারতবর্ষের আমরা কে। এ কি আমাদেরই ভারতবর্ষ। সেই আমরা কাহারা। সে কি বাঙালি, না মারাঠি, না পাঞ্জাবি, হিন্দু না মুসলমান? একদিন যাহারা সম্পূর্ণ সত্যের সহিত বলিতে পারিবে, আমরাই ভারতবর্ষ, আমরাই ভারতবাসী—সেই অখণ্ড প্রকাণ্ড আমরা'র মধ্যে যে-কেহই মিলিত হউক, তাহার মধ্যে হিন্দু মুসলমান ইংরেজ অথবা আরো যে কেহ আসিয়াই এক হউক না, তাহারাই হুকুম করিবার অধিকার পাইবে এখানে কে থাকিবে আর কে না থাকিবে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রতারণার জবাব দিতেই হবে

বরুণ কর

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীন হবার পর দেশ প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সম্মুখীন হয় ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে। ছ-ছটি দশক পেরিয়ে দেশবাসী আবার সপ্তদশ লোকসভা গঠনের অপেক্ষায়। নির্বাচনের নির্ঘন্ট ইতিমধ্যে প্রকাশিত। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলির তৎপরতা তাই তুঙ্গে। রাজ্যে রাজ্যে জোটগঠন করে বা আসন সমঝোতার প্রক্রিয়া জারি রেখে প্রতিটি দলই নির্বাচনের ময়দানে নেমে পড়েছে।

২০১৪ সালে দিল্লির মসনদে আসীন হয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী 'না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা'-র কড়ারে নিজেই চৌকিদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কিন্তু রাজকোষে চুরির বহর বেড়েছে বই কমেনি। চুরির নিন্দায় দেশবাসী মুখর। বিজেপি তাই দলের সব নেতাকেই এবার চৌকিদারের ভূমিকায় অভিনয়ের দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে। নতুন স্লোগান— 'নামুমকিন' নাকি 'অভি মুমকিন হ্যায়'। বিজেপি-র প্রধান প্রতিপক্ষ দলটিও বসে নেই। আঁক কষে প্রতিটি গরিব ভারতবাসীর পকেটে মাসিক ৬ হাজার হিসেবে বছরে ৭২,০০০ টাকা দেবার অঙ্গীকার করেছে। 'অন্যায়'-এর বিরুদ্ধে 'ন্যায়' প্রকল্পের এই ঘোষণায় কেমন যেন একটা 'মার দিয়া কেল্লা' ভাব। বেচারা গরিব ভারতবাসী, বিদায়ী সরকার— প্রতিশ্রুত পনেরো লাখ টাকার ব্যয়বরাদ্দ সেরে ফেলার আগে তাদের ঘাড়ে চাপল নতুন বোঝা— ৭২,০০০ টাকার। এত ঝক্কি সামলাবার মতো কাঁধের বা বুদ্ধির জোর কি তাদের আছে, কে জানে! নির্বাচনি বিধি প্রযোজ্য হবার আগে পর্যন্ত সংবাদমাধ্যমের পাতা জোড়া বিজ্ঞাপনে চালু ও নতুন প্রকল্পের যে ঢক্কানিনাদ শোনা গেছে, তাতে আমাদের চোখ প্রায় ছানাবড়ার আকারপ্রাপ্ত। এমতাবস্থায়, আমাদের রাজ্যের দিকে একটু নজর ঘোরানো যাক।

বদলা নয়, বদল চেয়ে ২০১১ সালের মে মাসে তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় আসে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বদল নয়, বদলার ঘটনাই ঘটেছে বেশি। বদলের মধ্যে ক্ষমতালাভের পর থেকে রাজ্যজুড়ে মূলত রংবদলের কাজ প্রাধান্য পেয়েছে। পুরোনো রং মুখ্যমন্ত্রীর না-পসন্দ। কেন্দ্রে তিনি যখন রেল মন্ত্রকের দায়িত্ব পান, তখনও দেখা গেছে এক ছবি। স্টেশন সংলগ্ন অফিসবাড়িগুলির রং বদলেছে প্রায় রাতারাতি। এ যেন সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া— দেখো, কেমন কাজ শুরু হয়ে গেছে। সুদিনের আর দেরি নেই। রাজ্যে নীল-সাদা রং-এর মাধ্যমে সেই একই চেষ্টা। পরিবর্তন যা কিছু, তা যদি 'এইটুকুই' বলি, তাতে বিন্দুমাত্র অতিকথন হবে বলে মনে হয় না। বিরোধী কণ্ঠকে স্তব্ধ করার জন্য সুকৌশলে চালু করা হল সবাইকে সন্তুষ্ট করার জন্য নানাবিধ বন্দোবস্ত। ক্লাব থেকে শুরু করে শিল্পী, সাহিত্যিক, খেলোয়াড়— বাদ গেল না কেউ। ব্যক্তিবিশেষ আবার একাধিকবার পরিতুষ্ট করার চেষ্টা। এখানেই শেষ নয়, বিরোধী যারা তাদের জন্য বরাদ্দ হল মিথ্যা মামলা, পুলিশ-সহ দলীয় কর্মীদের উসকে দিয়ে নানা নিগ্রহের পালা। ধর্ষণ রাজ্যে প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে উঠল। সোজা কথায়, সবাইকে ভয় পাইয়ে দাও। হয় মুখ বুজে সব কিছু মেনে নাও নয়তো মাত্রা বুঝে দাওয়াই-এর বন্দোবস্ত। ৩৪ বছরের বামশাসনে রাজ্যের যে হতশ্রী অবস্থা (?) তার থেকে বেরোবার একটাই রাস্তা— শুধু উন্নয়ন। উন্নয়নের দামামা যাতে শোনা যায় তার জন্য সান্ধ্যকালীন ঘণ্টা খানেকের বরাদ্দ যথেষ্ট। সঙ্গে যোগ্য সঙ্গতের জন্য প্রভাতী সংবাদপত্রের সাংবাদিককুল তো আছেই। দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় বিরোধিতাহীন রাজ্যপাট পরিচালনে নেতা থেকে মন্ত্রী, আমলা থেকে পুলিশ সবাই শশব্যস্ত। শুধু নির্দেশের অপেক্ষা।

বাম শাসনকালে প্রতিটি নির্বাচনের পরে তৎকালীন বিরোধী দলের (বর্তমান শাসকদল) গলায় শোনা যেত রিগিঙের কথা। এ বিষয়ে বিগত আট বছরে রাজ্যবাসীর অভিজ্ঞতা যে খুব সুখকর তা বোধ হয় বলা যাবে না। নির্বাচন না করা, করলে বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়নে বাধা দেওয়া থেকে শুরু করে ফল ঘোষণা পর্যন্ত নানা কারচুপির বহু উদাহরণ মজুত। আবার যেখানে যেখানে এত সব কায়দা করা সম্ভব না হওয়ায় বিরোধীরা গরিষ্ঠতা পেয়ে যায়, সেখানে নেওয়া হয় অন্য ব্যবস্থা। টাকার খেলায় বিজয়ী প্রার্থীদের কিনে নেওয়ার চেষ্টা

থেকে টাকার বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়া পর্যন্ত নানা বিধি বন্দোবস্ত। ভারতীয় গণতন্ত্রে দল বদল এখন যেন জলভাত। আদর্শ, দায়বদ্ধতা শুধু কথার কথা। পানের থেকে চুন খসার অপেক্ষা করতে হয় না কাউকে। পদ বা মর্যাদা খসলেই এদের বোধোদয় হয়। শাসকদলের একসময়ের দুই নম্বর নেতা দলবদল করে এখন রাজ্যে বিজেপি-র নির্বাচনি যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। দল বদল করানো বা বিরোধী বোর্ডের রং বদল করার খেলায় তার মুনশিয়ানা প্রায় শিল্পস্তরে উত্তীর্ণ। হাস্যকর যা তা হল দল পরিবর্তনের পর পুরোনো দল সম্পর্কে দল পরিবর্তনকারীর মূল্যায়ন। নতুন দলে তাকে স্বাগত জানানোর মঞ্চটিও রোমাঞ্চকর বৈকি! হাস্যকর, বললাম বটে, প্রকৃতপক্ষে এই পর্বটি এখন বিবমিষার কারণ হয়ে উঠেছে। এবার আসা যাক, দুর্নীতি প্রসঙ্গে। এ প্রসঙ্গে, বোধ করি, যত কম কথা বলা যায় ততই মঙ্গল। দুর্নীতি এ রাজ্যে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নিয়েছে। পরিধেয় বস্ত্রের ন্যায় দুর্নীতি শাসকদলের নেতা মন্ত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরে অপরিহার্যপ্রায়। দোরগোড়ায় নির্বাচনের প্রেক্ষিতে শাসকদলটির প্রার্থীদের প্রায় আপনার ঘরের সদস্যপদ দিয়ে দেবার খেলায় এরা এখন গলদঘর্ম। নারদকাণ্ডে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে যাদের 'আগে জানলে মনোনয়ন দিতাম না' বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, সেই অভিযুক্তদের অনেকেই আবার প্রার্থী তালিকায়। কারণ ২০১৬ সাল থেকে সেই যে তদন্ত শুরু হয়েছে, তা চলছে এখনও, চলবেও বোধ হয়। সারদাকাণ্ডের তদন্তেরও একই অবস্থা। বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল যে দলের কথাই বলুন দল বদলকারী নেতারাই হলেন তুরুপের তাস। এ যেন অনেকটা সেই কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার চেষ্টা। এদের প্রার্থী তালিকাও বৈচিত্র্যে পূর্ণ। দলবদল, দুর্নীতি, রূপালি ঝলক সবরকম বৈচিত্র্যে ঠাসা। এ রাজ্যে বিজেপি-র সাংগঠনিক চেহারা যাই হোক না কেন, এ দলটিকে দ্বিতীয় স্থানে সংবাদমাধ্যম ইতিমধ্যে জায়গা দিয়ে রেখেছে। এর সঙ্গে আছে প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষার ফলাফল, যেখানে বামপন্থীদের অবস্থান নিশ্চিতভাবে পিছন দিকে। ভারতীয় গণতন্ত্রে আরো তিনটি উপাদান সম্প্রতি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। সেগুলি হল— বিরিয়ানি, মদ ও অর্থ। পশ্চিমবঙ্গ এ ব্যাপারে গর্ব করার মতো জায়গায় আছে। একটি তথ্য অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ২০১১-১২ সালের আবগারি রাজস্ব ২১১৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০১৯-এর জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে দাঁড়িয়েছে ১০,০০০ কোটি টাকায়।

সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করে বামকর্মীদের উচিত অনেক বেশি সজাগ ও সতর্ক হয়ে প্রচারে বিন্দুমাত্র ফাঁক না রেখে ভোটদাতাদের কাছে পৌঁছে এই বার্তা দেওয়া যে ভারতের বর্তমান অবস্থায় সংসদে বামপ্রার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি বেশি করে প্রয়োজন। কারণ, অভিজ্ঞতা বলে, বাম সাংসদরা ছাড়া পার্লামেন্টে জনগণের মৌলিক সমস্যা যেমন বেকারি দূরীকরণ, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের প্রসার, বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়ায় লাগাম টানা, ন্যূনতম পেনশন ও মজুরি, কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্য, বনভূমি সংরক্ষণ, মহিলা সংরক্ষণ ও সমকাজে সমান মজুরি, সামাজিক ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্প্রসারণ ও গণতান্ত্রিক কাঠামো অটুট রাখার মতো জরুরি বিষয়গুলো তুলে ধরার দায় অন্য কোনো দলের নেই। কেন্দ্র ও অন্যান্য রাজ্যের মতো এ রাজ্যেও অবাধে জাতপাত, ধর্ম ও ভাষার নিরিখে চলছে বিভাজনের খেলা, ছাত্র ক্যাম্পাসে বিশৃঙ্খলা ও ভয়ের বাতাবরণ, যেকোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়ার মতো কাজ। শিল্প ও ব্যবসায়ী মহলের হাত দলগুলির মাথায় এতটাই যে দুর্নীতি ও স্বার্থসিদ্ধির নানা পাঁক গায়ে মেখেও তারা উন্নতশির। একমাত্র স্বাধীন, সুচিন্তিত ভোটাধিকার ও তার প্রয়োগই ক্ষমতা ধরে ওই মাথা হেঁট করার— সে সময় আসন্ন।

উচ্চশিক্ষার সমুচ্চ তা-লে-বে-তা-লে

সুমন ভট্টাচার্য

সিবিসিএস বা 'বাছাই' মূলা ঋণসং'কুলা'ন

উচ্চশিক্ষা! উচ্চশিক্ষা! মর্মে ন কড়ি চর্মে ক্ষীর
সূচ্যগ্রের মেদিনী-আদায়ী পুচ্ছে শোভিত উচ্চশির!

উচ্চশিক্ষার যথাযথ এবং যথার্থতর-তম উচ্চতা-অর্জনের প্রয়াসে স্নাতক স্তরে এসেছে সিবিসিএস, চয়েস বেসড ক্রেডিট সিস্টেম। বেশ বেশ অনেক অনেক উন্নততর পঠন-পাঠন পদ্ধতি উপস্থাপনার স্বপ্ন থেকে গন্তব্যের সাফল্যের বক্তব্যগর্বিত এই ব্যবস্থা। এবং আরো আনন্দের কথা যে, এও একদম খাঁটি গণতন্ত্রের মতোই পুরোপুরি পরীক্ষার্থী-তান্ত্রিক। অর্থাৎ পরীক্ষার্থীমঙ্গলে, পরীক্ষার্থীদের জন্য, পরীক্ষার্থীদের দ্বারাই এই পদ্ধতির চলন-বিচলন, নাকি চাল-বেচাল? আচ্ছা, তৃতীয় পর্যায়ে বোধহয় ভুল হল!! না-কি!

এই ব্যবস্থার প্রথম বিশিষ্টতা— একই পাঠক্রম নিয়ে বছর ধরে ঘ্যাঁষ্টাতে হবে না! ছ-মাস, ছ-মাস। একটুখানি পড়বে— টুক করে একটা পরীক্ষা। আবার একটু— এবং আবার। পরীক্ষার্থীর অবস্থান থেকে তো খুশিই হওয়ার কথা। কারণ— বিষয় পিছু নম্বর-বরাদ্দ ৭৫। তার মধ্যে খাতায় লিখতে হবে ষাট-এর উত্তর। কলেজের হাতে পনেরো। আবার এই যে ষাট মধ্যেও আছে চমৎকার দুই-নম্বর ধন্য বস্তুনিষ্ঠ-প্রশ্নমালা। এবং অতঃপর ৫, ১০।

ব্যবস্থাপত্র পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল যেন রবীন্দ্রনাথের *তাসের দেশ* বা সুকুমার রায়-এর *হ য ব র ল*-র কোনো প্র্যাকটিকাল। এখানে সাবেক 'অনার্স' নামান্তরে মেজর। ঝুরঝুরে ইলেকটিভ বা জেনারেল, দ্বিখণ্ডিত। মেজর-ওয়ালাদের জন্য জি-ই অর্থাৎ Generic Elective এবং মেজর নিঃস্বদের জন্য সিসি, Core Course, এবং এদের পাঠ্যক্রম আলাদা। কিন্তু সে ভিন্নতার ভিত্তি বা যুক্তি কোথায়? তা এখনও, অন্তত এই পাঠকের কাছে অস্পষ্ট। এবং তারপরেও নানান আদ্যাক্ষরের আদ্যাশক্তি— LCC, AICC, MIL— বাড়ির নাম কিংকর্তব্যবিমূঢ় ইত্যাদি ইত্যাদি!

তা হোক, জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক। আপত্তি নেই— কিন্তু সমস্যা অন্যত্র। পড়ুয়াদের জন্য পড়বার বা তালিম নেওয়ার সময় কতটুকু? আর কলেজের অধ্যাপিকা ও পক-দেরই-বা পাঠদানের ফুরসত কতটুকু?

শিক্ষাবর্ষের সূচনা থেকে অন্তিম— আয়োজন করতে হয় তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়-পরীক্ষার। পার্ট-ওয়ান-টু-থ্রি। এই পদ্ধতির প্রবল জোয়ারে তা প্রবর্ধিত হবে ছ-টিতে। নম্বরের বরাদ্দ, সে, ষাট হোক বা একশো— মেজর-জিই-সিসি ইত্যাদির প্রভৃতিতে দিনসংখ্যা একই। তাহলে যাকে শ্রেণিকক্ষ শিক্ষাদান বলে, তার জন্য বরাদ্দ সময় থাকবে কতটুকু?

এবার প্রশ্ন উঠবে, অধ্যাপকরা তো ক্লাসে পড়াতে আগ্রহীও নন তেমন, যে কারণে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজিরার অঙ্ক সর্বৈব তলানিতে। আবার গত বছর ভর্তি হওয়ার তারিখ পার করেও আসন ফাঁকা পড়েছিল চল্লিশ হাজার। এত করেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী কলেজগুলিতে সামগ্রিক ফল খুব আশাব্যঞ্জক নয়। আর কলেজের ফল খারাপ হলে অবশ্যই তার দায় সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকদের!

দীর্ঘকাল ধরেই কলেজের অধ্যাপককুল অতিশয় করুণার পাত্র— এক গ্লানিতাড়িত সম্প্রদায়। কারণ, একমাত্র ক্লাসে পাঠদান বাদে তাঁদের ওপর শিক্ষাভুবনের যে ভার ন্যস্ত তা ক্ষমতাহীন দায়িত্বপালন। যখন দু-বছরের পার্ট-ওয়ান ছিল, তখনও একটি বার্ষিক এবং একটি নির্বাচনী পরীক্ষা হত। ফলে উৎসাহী পড়ুয়াদের কিছুটা তালিম দেওয়ার সুযোগও ছিল। এরপর এল ইউনিট টেস্ট ব্যবস্থা। যেহেতু তার নম্বরের শতকরা ভাগ যুক্ত হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার নম্বরের সঙ্গে, সুতরাং সেখানে খাতা দেখা বা শুধরে দেওয়ার কথা ভাবাটাই বেয়াদবি। ফুল ফুটুক না ফুটুক— fool-কে দিতে হবে ফুটন্ত শতকরা আশি ভাগ নম্বর, সম্ভব হলে 'ফুল' নম্বরই। নয়তো নম্বর-না-দেওয়া অধ্যাপককে ফোটানো হবে মানসিক, কখনো-বা শারীরিক নির্যাতনেরও হুল! তার থেকে নম্বরটা দিয়ে 'দাওয়াই' ভালো! সুতরাং এই অবস্থায় ইউনিট টেস্ট একবার বিদায়

নিয়েও, খোদ পাগলা দাশু-র মতোই এই সিবিসিএস-এর হাত ধরে আবার সে এসেছে ফিরিয়া। পাঠদানমগ্ন অধ্যাপকদের দিকে চোখ মটকে বলেও: বলে যাও কী বলিতেছিলে!!

আর বলা বাহুল্য— এই পর্যায়ে সে বলাও আর সোজা নয়। এই পাঠকের পক্ষে বিজ্ঞান বা বাণিজ্য শাখার পাঠদানের সমস্যা— যদি সেক্ষেত্রে আদৌ থাকে— অজ্ঞাত। কিন্তু মানবিকীবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়েই যে বিস্তৃত পাঠ্যক্রম, তার বিশ্লেষণ তার রূপ আর রূপান্তর— আনুষঙ্গিক বা সমান্তরাল বিষয়ের সঙ্গে পরিচয়— যা দরকার ধারণা-নির্মাণে, সেই পাঠচর্চার সুযোগ পরিসর অনেকটাই হারিয়েছিল সেই এক বার্ষিক পার্টওয়ানে এসে— এবং অধুনা একেবারেই ক্যাপসুল দানের যুগ।

গ্রন্থে উপস্থাপিত বিষয়কে যথাশক্তি বিস্তৃত বা বিস্তৃততর পরিসরে বিশ্লেষণ করা— তার স্পষ্ট ধারণা আর আনুষঙ্গিক তথ্যজ্ঞান যদি হয় পাঠদানের শৃঙ্খলা বা প্রত্যাশিত শৃঙ্খলা, তো তার সময় কোথায়? সচরাচর পরস্পর দু-বছর একই যেকোনো বিষয়েরই প্রশ্নে বিষয় পুনরাবর্তিত হয় না, সুতরাং তার খাতিরে গজিয়ে ওঠে সাজেশন-নামা বিয়োজন পদ্ধতি। বিষয়ের ক্ষেত্রে যত গুরুত্বপূর্ণ হোক, পরীক্ষায় তা সাময়িকভাবে অচ্ছুত! সুতরাং বাদ যায় প্রায় অর্ধাংশ! এরপর অধ্যাপকের সংকট দ্বিবিধ। যদি তিনি ব্যাখ্যা করে বিষয়ের মূল ধরে পড়াতে চান, তবে তার পরিচয়— 'হ্যাজাচ্ছে' অথবা 'ফালতু ভাটাচ্ছে'। সুতরাং তা-ও বর্জিত। অতঃপর যদি শুধু বিষয়ে আহত থাকেন, তো, যাদের সঙ্গে অন্তত গ্রন্থের সম্পর্ক বা পরিচয় আছে, তারা বোঝে, যে তা তাদের হাতে থাকা বই-এরই মৌখিক উপস্থাপন। সুতরাং তার পরিচয় 'ওগরাচ্ছে'— সুতরাং অন্যতর আকর্ষণ না থাকলে, সত্যিই কোনো মানে হয় না সে ক্লাসে থাকার।

আরো একটি পদ্ধতির আশ্রয় নিতেন কেউ কেউ। বিষয়ের মাঝখান থেকে আরম্ভ করে, তারপর তার উৎসে ও পরিপার্শ্বে ভ্রমণ-চারণের পদ্ধতি। কিন্তু এই বাছাই-এর ছাই ফেলতে সে ভাঙা কুলাও এবার অকেজো।

এই পাঠকের গোলমেলে মাথায় তাই ক্রেডিট-টা বুঝবার প্রাণপণ শক্তিতেও তার কৃতিত্ব বা চমৎকৃতিত্বর হদিশ নেই! বোধহয় শিক্ষাগ্রহণের মন বা ইচ্ছার দলিল দাখিলায়, শিক্ষিত হয়ে ওঠার চেষ্টাটাই বন্ধক দিয়ে, নম্বরটা দেওয়া হচ্ছে ঋণ হিসেবেই! কারণ, নতুন কীসব নিয়মে তো ঋণটা মকুবের জন্যই!!

২

গাডাসক্তি মহামায়া: গূঢ়পাতাল মহাপাতাল নম নম নমঃ
উচ্চশিক্ষা! উচ্চশিক্ষা! কর্মে হাডুডু, নর্মে নীর
নোট-এ নম্বরে লোটা কম্বলে পুষ্টিসাধন পুচ্ছটির!

পরীক্ষার্থীরা কয়েকটা নম্বর বেশি পেলে মশায়ের এত গাত্রদাহর কারণ কী? নিজে অত নম্বর পাননি, তাই?—এবার এই প্রশ্নই অবধারিত।

না। অধ্যাপককুল এমতো অসূয়াপরায়ণ নন। সমস্যাটা অন্যত্র। যে কারণে শিক্ষাগ্রহণ নামে শব্দটা আছে, এই পদ্ধতিতে গ্রহণ-টা আর receive নয়, তা যেন eclipse-এর অর্থযাত্রী। প্রথমত, অন্তর্বর্তী যে নম্বর-যোগ, সেখানে পনেরোয় গড়ে বারো কি তেরো দেওয়া অলিখিতভাবেই বাধ্যতামূলক। যেহেতু ক্লাসে পাঠদান প্রায়শ বিঘ্নিত, সুতরাং বস্তুনিষ্ঠ প্রশ্নের পর্যায়েও তা পঞ্চপাণ্ডবরা ক-ভাই ছিল গোছের। এবং অবশিষ্ট ৭ বা ১০ নম্বরের প্রশ্নেও সেই প্রশ্নও শেষপর্যন্ত পার্ট মার্ক বা অংশ-মূল্যে খণ্ডিত— তদুপরি সে প্রশ্নের মধ্যেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নেই কোনো। ফলত নম্বরযোগ অত্যন্ত সুরক্ষিতই। কিন্তু সে নম্বরে শেষপর্যন্ত লাভ কোথায়?

প্রতিষ্ঠানে নাম নথিভুক্তির কারণ একটি-দুটি ডিগ্রি অর্জন। আর ডিগ্রি দরকার চাকরি পেতে। সরকারি চাকরির জন্য পরীক্ষার আয়োজনই অধুনা শম্বুকগতি। এবং মহামহিম শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীহস্তে শম্বুকহত্যার ঘটনাও মহাকাব্যিক সত্য! তাই রাষ্ট্রীয় আয়োজনে যদি তারা নম্বরটাই পায়, তাহলেও কিছু একটা দেওয়া-থোওয়াও হল এবং পাওয়া-টাওয়াও! কিন্তু জীবিকাকেন্দ্রিক পরীক্ষায় সাজেশন, এখনও, অনেকটাই অচল! সুতরাং, প্রাপ্ত নম্বরের বিচারে শিক্ষাজগতে ভূম্যধিকার পাওয়ার পরিতোষদীপ্ত পরীক্ষার্থীরা এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বা পরে সাক্ষাৎকার-এর পরম পর্বে এসে বিহ্বল। বিমূঢ়। তাদের সেই ব্যর্থতার বা অসম্পূর্ণতার বা ওরকম অসম্পূর্ণ হয়ে থাকার দায় কার?

অবশ্য এবার কথা বলবে পরিসংখ্যান। স্কুল বা কলেজ শিক্ষকতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সংখ্যাও তো উদ্‌বৃত্ত। এঁরা কি যোগ্য নন? মুখে মানুন বা না-মানুন, সকলে জানেন, জীবিকার পরীক্ষার অন্দরমহল অনেকটাই সমাপতনযোগ। অপরাপর নৈতিক পতনঘটিত উত্থানও তুমুল। সেখানে শিক্ষিত হওয়ারও আর দরকার নেই— বলতে গেলে একেবারেই!

যে-দেশে শিক্ষা আর ছাপছোপ, শিক্ষা আর জীবিকা সমীকরণসিদ্ধ, সেখানে কর্মসংস্থানই তো শিক্ষিত হওয়ার চরম পরিচায়ক!! সেক্ষেত্রে দীর্ঘকালই সরকারি চাকরির পরীক্ষাই চরমতর অনিয়মিত— তার পরবর্তী ধাপের অগ্রসরতায় এগোতে হয় অনশন ধর্মঘটে! অন্যান্য মেজো-সেজো চাকরির ক্ষেত্রেও দুর্জনেরা বলে যে, পরীক্ষা একটি নিয়মরক্ষার ধোঁকার টাটি। পরীক্ষার অনেক আগেই নির্ণায়ক-নিয়ামক প্রভুকুলের পদে বা করতলে অগ্রিম প্রদত্ত 'কর' নিবেদনের যোগ্যতাই শেষ কথা! সুতরাং নম্বরভার-নম্র বা নত নয়, উদ্ধত স্নাতক বা

স্নাতকোত্তরদের একমেব ভরসাস্থল ব্যক্তিগত বিদ্যাদান বা বিদ্যাসত্র পরিচালন। কলকাতায় কম কিন্তু জেলাসদর বা পারিপার্শ্বিক গ্রামাঞ্চলে বাড়ির দেওয়াল থেকে পাড়ার মোড় বা পাড়ার মোড় থেকে তুলনামূলক বড়ো রাস্তার চৌমাথায় ফ্লেক্স: সর্বোৎকৃষ্ট কোচিং— পঞ্চম থেকে দ্বাদশ অথবা দ্বাদশ থেকে স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান— এমএ-তে ফার্স্টক্লাস-প্রাপ্ত অমুক বা নেট-সেট উত্তীর্ণ তমুক ইত্যাদি। তাঁদের এই ডিগ্রির পশ্চাদভূমি নিয়ে তদন্ত করলে তার ফলাফল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্তু খুব ইতিবাচক হবে না। কিন্তু এঁদের দোষ দেওয়াও অপরাধ। যে রাষ্ট্রে শিক্ষা আর জীবিকার সমীকরণসিদ্ধির পরেও শেষপর্যন্ত জীবিকার সংস্থান হয় না, বা ক্রমশ মিলিয়ে যায় তার সম্ভাবনার চেহারাও, তখন এই অন্ধকারের ক্রমোত্থানই স্বাভাবিক। এখানে ছাত্রকুলের দোষ কোথায়?

যারা ইস্কুলে বা ইস্কুল থেকে কলেজে বা তারপরেও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে, তাদের কিন্তু আর ছাত্র-ছাত্রী পরিচয়ে দেখা হয় না! তারা কেউ আর শিক্ষার্থী নয়। পরীক্ষার্থী।

তা-ও যেটুকুও-বা শিক্ষার্থী-পর্ব ছিল, এবার সিবিসিএস-এর বদান্যতায়, মুছে যেন গেল শেষটুকুও।

না, নতুন ব্যবস্থা বলেই তাকে আক্রমণ করে, তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কটূক্তি করবার কোনো মানসিক পরিতোষের আসর নয়। যাঁরা যথাযথ শিক্ষার্থী, তাঁরা যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করেই অবিচল থাকেন তাঁদের ব্রতে। আবার যারা আদৌ তা নয়, তাদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তনে পাঠালেও তাদের আন্তরিক অনিচ্ছার বিচলন ঘটবে না বিশেষ। কিন্তু যারা তার মধ্যবর্তী পর্যায়ের— উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষাদাতাদের দায়িত্বশীল ও সহৃদয়, প্রাগ্রসর ও সযত্ন শিক্ষকতায় তারা উজ্জীবিত, উদ্দীপিত হয়। বা বিপরীতক্রমে গা ঢিলে দেওয়া গয়ংগচ্ছ গড্ডলিকায়— তারও অংশী হয় নিজেরাই 'চলতি হাওয়ার পন্থী' ধর্মিতার গণতন্ত্রে মিইয়ে যায় যাদের অনুশীলনের মনও— ক্ষতিটা হচ্ছে ওই গড় শিক্ষার্থীদের। যাকে অধ্যয়ন বলে, আর যা, প্রকৃত অর্থেই কথাটা যতই বুড়োটে বা জ্যাঠামোমার্কা হোক— নিরন্তর তপশ্চর্যা, অনুশীলন— পাঠ্যক্রমের সীমিত অংশকেই সম্পূর্ণ জেনে, তার অংশবিশেষকে আশ্রয় করে পরীক্ষার করুণাময় নম্বরকে যারা মনে করছে যোগ্যতার এভারেস্টবিজয়, সেই গিরিলঙ্ঘন সমর্থ বা গিরিলঙ্ঘন সামর্থ্যে অর্জিত যে পঙ্গুতা, তাদের সেই পঙ্গুত্বের দায় কার? এমনও নয় যে বিশ্ববিদ্যালয়-পর্যায়েও পরীক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করবার অভিসন্ধি নিয়ে এই বয়ানের অবতারণা। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দাবিটা এখানে যে, পরীক্ষার্থীকে তার বিশ্লেষণী মনের, বিবেচনাশক্তির বিকাশের আর সমন্বয়ী জ্ঞান আর ধারণা প্রয়োগের পরিসরে আনতে হবে। গত কুড়ি বছরের উচ্চমাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর স্তরের পরীক্ষার প্রশ্নগুলি একবার লক্ষ করুন। পুনর্বার মার্জনার্থী-স্বীকারোক্তি, বিজ্ঞান বা বাণিজ্য শাখার প্রশ্নের কথায় অনধিকারচর্চার কোনো অভিপ্রায় নেই (তবু যাঁরা এ বিষয়ে অধিকারী, তাঁরা সেই বিষয়গুলিও দেখুন)। যাকে বড় প্রশ্ন বলে তা শতকরা পঁচানব্বই ভাগই বিবরণকেন্দ্রিক। বহিরঙ্গ সীমিত। একটি-দুটি বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নর দেখা পাওয়া গেছে ক্বচিৎ কখনো! ফলে সাহিত্যসহ সমাজ বিজ্ঞানের শৃঙ্খলা যে সমাজসাপেক্ষ— রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে পরিচয় সাপেক্ষ জ্ঞান ও ধারণার বিকাশের, তথা পরিস্থিতি সচেতন বিচারবোধের যুক্তিসন্ধানী মননের প্রত্যাশী— কোনো বিকাশ ঘটছে না তার।

ফলে, এই পরীক্ষাপদ্ধতিতে নিম্নমেধা লাভবান হচ্ছে— অধুনা সহসা অতিনিন্দিত যে মধ্যমেধা তারাও ফলের নিরিখে লাভবানই, কিন্তু আদতে তাদেরও অনুশীলনের মনকেও নষ্ট করে দেওয়ার যে আয়োজন, তাতে ক্ষতির বহর এবং লহর অপূরণীয়।

আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়, কলকাতাস্থিত বা তার পঁচিশ কিলোমিটারের গড় বলয়ের বিদ্যাসত্রের ছাত্র-ছাত্রীরা ইচ্ছে করলে নিজেদের তৈরি করে নিতে পারে। কিন্তু পঞ্চাশ-একশো-দু-শো-পাঁচ-শো কিলোমিটার দূরের কলেজের পড়ুয়ারা? তাদের অধিকাংশই কিন্তু ভালো বই-এর কথা জানতেও পারে না!

সচরাচর কলেজ লাইব্রেরিতে বই আসে নির্ধারিত পাঠক্রমতাড়িত পাঠ্য, এবং স্বরূপগর্বিত বা কুশলী ছদ্মবেশচারী গাদা গাদা নোটবই। এবং আঞ্চলিক সরকারি বা সরকার-পরিপোষিত গ্রন্থাগার— যদি থাকে তো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার পরিসেবা নামমাত্র। এবং সিলেবাসের বই বাদে, বিজ্ঞানের বই, বাংলা বা ইংরেজি-বিজ্ঞানচর্চার বা গবেষণামূলক বই থাকেই না। এই বক্তব্য মিথ্যে প্রমাণিত হলেই তা আনন্দের। এর ফলে যে পড়ুয়ারা অনেকটাই গ্রন্থতৃষ্ণা বা পাঠক্ষুধায় চালিত, ক্রমশ নষ্ট হয় তাদের ক্ষুধাবোধই।

সুতরাং পদ্ধতির পরিবর্তন নিয়ে কোনো বিরূপতা না তুলে, সেই পরিবর্তনের অভিমুখকে বিচার করবার অনুরোধই মূল কথা। যতক্ষণ পর্যন্ত না পাঠ্যকে তার কার্যকারণ-সম্পর্কের অনিবার্যতায় বা সমাপতনের সূত্রসন্ধানে বা প্রাকল্পিক-বৈকল্পিক পরিস্থিতির সম্ভাবনা বিচারের উপস্থাপনার দিকদিগন্তে ঠেলে দেওয়া না-হয়, ততক্ষণ তার কোনো অর্জনসিদ্ধি আসে না। ইতিহাস-দর্শন-রাষ্ট্রবিজ্ঞান— সর্বত্রই শুধু তথ্যের পুনরাবৃত্তি। তত্ত্বগুলিও দেখা দেয় তথ্যপ্রায় হয়ে। ফলে পরীক্ষার ঘরে পরীক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গে শোভিত টুকলির পাতা যেমন—

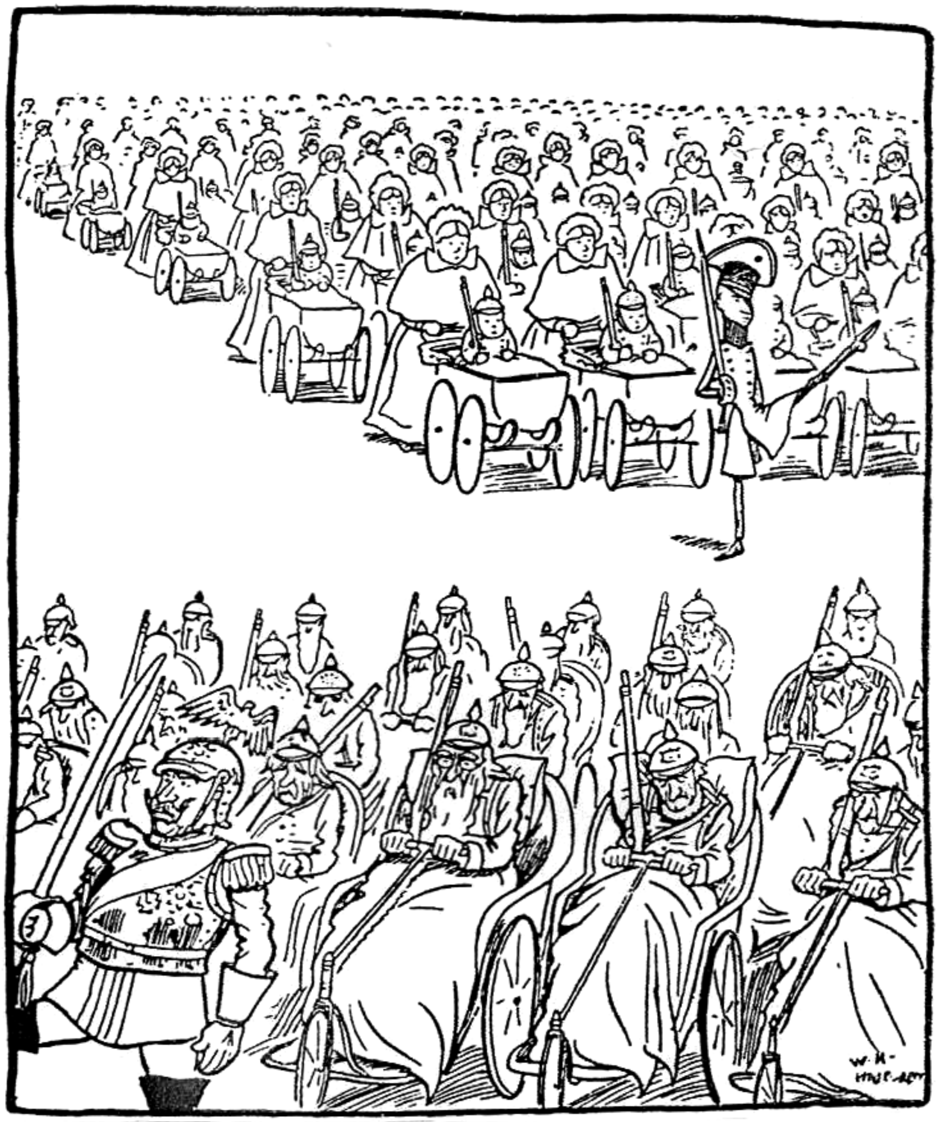

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ব্রিটিশ কার্টুন— "The Sad Adventures of Little and Big Willie"-এ যুদ্ধোত্তর জার্মানি।

'তোতাকাহিনী'র মৃত পাখিটির অন্তঃসারের পূর্ণতা ঘোষণা করেছিল, তেমনই খসখস গজগজ করে। যারা টুকলিসিদ্ধ নয়, অন্তত সেটুকু নৈতিকতার চলন যাদের এখনও আছে, তাদের মাথাতেও ওই ঘটনার বিবৃতিসার উত্তরমালাও অনুরূপ খসখস গজগজ প্রবণ, তার বেশি কিছু না!

প্রথম বিশ্বযুদ্ধর পরবর্তীকালের এই ব্যঙ্গচিত্রটি যেন হয়ে যায়, এই শিক্ষাব্যবস্থার একটি রূপক। একদিকে চলচ্ছক্তি বিসর্জিত প্রজ্ঞাহীন, রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শিরস্ত্রাণে আত্মরক্ষাতুর স্থবিরদের চক্রাসনী সচলতা! আর অপরদিকে অনর্জিত চলচ্ছক্তি প্যারাম্বুলেটর-বাহিত শিশুকুল, তাদেরও মাথায় রাষ্ট্রনির্দেশিকার বর্মচর্ম। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয়ঃ। পরীক্ষায় দরকার নম্বর। নম্বরের জন্য অনুশীলনের বা নিবিড় অধ্যয়নের পরিবর্তে যদি অমন প্যারাম্বুলেটরের ঠেলাতেই কাজ চলে, তার থেকে পরম সহজিয়া পন্থা আর আছে!!

মেধাবর্জিত প্রশ্ন আর যেমন-তেমন খানিকটা উত্তর লিখলেই, তাতে খানিকটা নম্বরের লঙ্গরখানায়, শিক্ষা-অর্জনের স্পৃহা যে গাড্ডায় গিয়ে পড়ে, তার আসক্তিও যে অসাধারণ! এবার যেন স্পষ্ট হয়, তৃতীয় পর্যায়টি। বলতে গেলে তো পরীক্ষার্থীদের দ্বারাই চালিত! অন্তর্বর্তী পরীক্ষায় পনেরোয় গড়ে বারো/তেরো। লিখিত পরীক্ষায় উত্তরের কোণ খামচি খুঁটে

ঢালতে হবে নম্বর। কৃতী-ছাত্রের কৃতিত্বের গৌরব প্রাইভেট শিক্ষকের। ব্যর্থতার রৌরব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন *আত্মশক্তি*-র কথা। তার ব্যাখ্যা অধুনা সমূহ পরিবর্তিত। রবীন্দ্রনাথ শ-খানেক বছর আগেই লিখেছিলেন কী যেন কাঁচাদের কথা!! হ্যাঁ— তার সাফল্য পাতে গরম: ওরে অবুঝ, ওরে আমার কাঁচা/পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা! —যথার্থ। পুচ্ছটির উচ্চতায় মাথা অনেকটাই নত। আরো নত হতে পারলে বর্তে যায়।

৩

আসিতেছে চলে/শিক্ষা দেবে, শিক্ষা দেবে বলে
উচ্চশিক্ষা! উচ্চশিক্ষা! বর্মে খড়গ, ঘর্মে চিড়
ভক্তিবাঁধন নিক্তিসাধন ডিগ্রিড্যাগার-পুচ্ছ বীর।

সিবিসিএস-এর নিয়ম‘কাননে’ শিক্ষার্থীর ক্ষতির ব্যাপারটা প্রমাণ করা যাবে না। অধ্যাপকদের অতৃপ্তির কথাও আমল পাবে না মোটে। কিন্তু উচ্চশিক্ষাসত্রে আরো এক সম্প্রদায় আছেন, যাঁদের পূর্বপরিচয় ছিল পার্টটাইমার। অংশকালীন অধ্যাপক। অধুনা তাঁরা গেস্ট লেকচারার। অতিথি-অধ্যাপক। ক্লাসপিছু তাঁদের সাম্মানিক বা পারিশ্রমিক। নতুন এই ব্যবস্থায় তাঁদেরও বরাদ্দ ক্লাস কমে গিয়ে, যে অর্থ তাঁরা পান— তা সাম্প্রতিক মানদণ্ডে হাস্যকর বা মর্মান্তিক।

সকলেই কিছু সম্পন্ন পরিবারের সন্তান নন যে, সেই অর্থের পরিমাণে তাঁরা উদাস থাকবেন, সকলেই টিউশানমৃগয়ার মন নিয়েও আসেন না— কিন্তু বেকারত্বের যন্ত্রণাপর্বে কিয়ৎ পরিমাণে স্বনির্ভরতার একটি আশ্রয় এই অতিথি-অধ্যাপকের জীবিকা আর তার ক্ষীণতনু আয়। কিন্তু সিবিসিএস-এর দৌলতে সেই ক্ষীণতা ক্ষীণতর।

না, অতিথি-অধ্যাপকদের আয় কাঠামোয় নজর রেখে পাঠক্রম আর তার সময়বিভাজনের প্রসারতাও বক্তব্য নয়। তা বহুমুখ সমস্যার হয়তো— গৌণ একটি দিক। এবং আরো একটি বার্তা ভাসমান বা বিধি সমাগত। কোনো কোনো কলেজে গৃহীত হতে চলেছে একটি কার্যক্রম। কলেজ থেকে পাশ করা যে ছাত্র-ছাত্রীরা নেট বা সেট উত্তীর্ণ তাঁরা তাঁদের কলেজে এসে কিছু ক্লাস নেবেন, কলেজও তাঁদের দেবে অভিজ্ঞতার শংসাপত্র। আর এই পরিসেবা অবৈতনিক। এবার সমস্যার সম্ভাব্য চেহারা দেখুন— যদি অবৈতনিক পরিসেবা পাওয়া যায়, তবে আর অতিথি-অধ্যাপকের কোন দরকার? আবার এই কার্যক্রমও সমূহ মানবিক। এখানে আপত্তি নিরর্থক।

যদি পাকাপোক্ত অধ্যাপকরা মনে করেন, তাঁদের গায়ে আঁচ লাগবে না— তাও মূর্খের স্বর্গ। কারণ, পরের ধাপে অধিকতর অনুরূপ কোনো সাঁড়াশিকুশলী বিতাড়নপন্থা যে আসবে না তা কে বলতে পারে? যে সমাজে শিক্ষিত বা উচ্চশিক্ষিত শ্রেণির মূল্য ছিল, শিক্ষকের সম্মান ছিল, সেই সমাজ বিলীয়মান।

শিক্ষকের মূল্য এখনও আছে, যাঁরা পেপার সেটার এবং তার গোপন তথ্য গোপনে সরবরাহক। অতটা না হলেও যাঁরা বৃহত্তর ছাত্র হিতৈষণায় প্রাপ্ত প্রশ্ন নিমেষে হোয়াটসঅ্যাপ যোগে চালান করে দেন পরীক্ষার হলে বা উত্তর প্রস্তুত করেই তা জোগান দিতে পারেন পরীক্ষার্থীদের! বিগত দুটি পরীক্ষার সময় এই কর্মধারার সামান্য সংবাদ, পত্রে বিবৃত।

প্রাইভেট টিউশন-ও দীর্ঘকালের, টুকলিও দীর্ঘকালের এবং প্রশ্ন ফাঁসও আবহমানকালের, সুধীর চক্রবর্তীর ‘দুলাল দত্ত যুগ যুগ জিয়ে’ (লেখাপড়া করে যে, ২০০৪) স্মর্তব্য। কিন্তু তার মাত্রা যখন মাত্রাছাড়া— তখন?

এবং শেষত আরো একটি বিষয়ে একটি জিজ্ঞাসা নম্বর তো সাম্প্রতকালে অত্যন্ত উন্নত। উচ্চফলনশীল। সিবিসিএস-এ তা হবে আরো উন্নতশির। তা যারা পুরোনো ব্যবস্থায়, মনে করা যাক, ২০১৯-এ স্নাতক, তাদের সঙ্গে, ২০২১-২২-এর স্নাতকদের সম্মিলন ঘটতে পারে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সংকটের সমভূমিতে। ২০২১-২২-এর স্নাতকদের নম্বর গড়ে বেশিই হওয়ার কথা— তো পরীক্ষার যোগ্যতার পরে ইন্টারভিউ-এর দরবারি শর্তপত্রে এদের নম্বর বা শতকরা মান আলাদাভাবে বিচার করা হবে তো? আসে নেট বা সেট পরীক্ষার তৃতীয় পত্রটি ছিল বিষয়কেন্দ্রিক ধারণাশক্তি আর তাকে প্রকাশ নৈপুণ্যের সংহতির বিচারক্ষেত্র। বেশ অনেক বছরই দ্বিতীয় এবং তৃতীয়পত্র উভয়ত এমসিকিউ অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ— টিক বা ঘনগোল্লায় তা পরীক্ষিত হবে কম্পিউটারে। এতে নেট-এও পাশের হার বেড়েছে। এবার পুনর্বার প্রশ্ন বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয়ই কি সর্বস্ব? মোটর গাড়ির বিবিধ যন্ত্রাংশের নাম জানাটা ভালোই কথা— কিন্তু তাদের যে সামগ্রিকতায় গাড়িটি চলে, তার তাত্ত্বিক জ্ঞান আর ব্যবহারিক প্রয়োগবিদ্যা এতে অর্জিত হয়?

‘যে শিক্ষা জীবনের অমৃত’ যেমন স্পষ্ট করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, নানারকম খেলনার আয়োজনে, হরেক জারগন-এর উচ্চারণবিলাসে, শিক্ষাব্যবস্থা সেই অমৃতকুম্ভের সন্ধানও করতে চাইছে? না হয়ে থাকছে তার রচনাকার ‘কালকূট’-এর বস্তুনিষ্ঠ প্রতিরূপ?

দেশপ্রেমিক নন্দলাল

অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ী

বিনোদ বিহারী, 'অবনীন্দ্রনাথের অনুবর্তীদের মধ্যে নন্দলালের মানসিক গঠন সর্বাপেক্ষা জটিল' বলেছেন। 'প্রাচীন ভারতের আদর্শ যেমন তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে তেমনি তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী প্রমুখ প্রেগতিশীল আদর্শের দ্বারা।' বিভিন্ন আদর্শের টানা-পোড়েন, বিভিন্ন ধরনের আদর্শের আনুগত্য স্বীকার প্রসঙ্গে মানসিক গঠন জটিল বলা হয়েছে। '...রবীন্দ্রনাথ গান্ধী প্রমুখ প্রগতিশীল আদর্শের দ্বারা'— প্রগতিশীল আদর্শ কথাটিতে কোনো বিরোধ নেই ধরে নিয়েও আমরা দেখব মত ও পথের সংঘাত এই প্রগতিশীল আদর্শেও— গান্ধীজি যেখানে চরকা কাটা সুতো কাটা, কি বিলাতি কাপড় বর্জনকে স্বরাজ লাভের অন্যতম উপায় মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ সেখানে আক্ষেপ জানিয়েছেন 'মহাত্মাজীর কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন কেননা তার মধ্যে সত্য আছে, অতএব এইতো ছিল আমাদের শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটি মাত্র সংকীর্ণ ক্ষেত্রে, তিনি বললেন সকলে মিলে সুতো কাটো, কাপড় বোনো— নন্দলাল একইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সর্বজনীন উদারনৈতিক আদর্শের কাছে আবার গান্ধীজির জাতীয়তাবাদী আদর্শের কাছে আনুগত্য স্বীকার করেছেন— এমনকী গান্ধীজির এই সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আহ্বানেও বিশ্বভারতীতে তিনি যেভাবে সাড়া দিয়েছেন এবং অন্যদের অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন তা থেকে প্রশ্ন উঠতে পারে এই পরস্পর বিরোধী প্রভাব-এর টানা-পোড়েন তিনি জীবনে কীভাবে অতিক্রম করেছিলেন। সামঞ্জস্য ঘটিয়েছেন, আমাদের মনে হয় দেশপ্রেম, এই আপাত বিরোধী নানা শক্তি, প্রভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটিয়েছিল। যে নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে, প্রকৃতপক্ষে শান্তিনিকেতনের টানে বিশ্বভারতীতে এসেছিলেন, বস্তুতপক্ষে দেশপ্রেমের একটা টানও তার পিছনে অবশ্যই সক্রিয় ছিল— সরকারি অর্থপুষ্ট সোসাইটিতে তিনি কাজ করতে চাননি, সেদিক থেকে বিশ্বভারতী তাঁর কাছে আদর্শ প্রতিষ্ঠান— দ্বিতীয়ত, তাঁকে ঘিরে রোলান্ডসে-রবীন্দ্রনাথ প্রশ্নে— তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠানেরই একজন হতে চেয়েছেন তার মূলে তাঁর দেশপ্রেম। এই দেশপ্রেমই আবার অসহযোগ আন্দোলন কি চরকা সুতো কাটাতে তাকে আকৃষ্ট করেছে— সমসাময়িক এই রাজনৈতিক আন্দোলন বা রাজনীতিকের এই সাময়িক পন্থা তাকে আন্দোলিত করলেও তিনি পরাধীন ভারতবাসী, স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী হিসেবে গান্ধীজির মত পথকে ব্যক্তিগত জীবনে, আচরণে মর্যাদা দিলেও তার বড়ো পরিচয় তিনি শিল্পী, শিল্পী নন্দলাল কিন্তু দীর্ঘকাল গান্ধীজিকে তাঁর শিল্প জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারেননি। যতদিন না গান্ধীজির আহ্বান এসেছে কংগ্রেস অধিবেশনে শিল্প সংক্রান্ত যাবতীয় ভার নিতে বা যতদিন পর্যন্ত না এই বিশ্বাস দূরীভূত হয়েছে মন্তে যে রং-তুলির মধ্য দিয়েই দেশমাতৃকার সেবা করা সম্ভব, জনগণকে আঁকা ছবির মধ্য দিয়েই উদ্‌বোধিত করা সম্ভব।

খড়্গপুর ছেড়ে কলকাতায় স্কুল-কলেজে পড়ার দিনগুলোতে আত্মীয়-বন্ধু দেবব্রত বসু— যিনি বিপ্লবী অরবিন্দর অনুগামী বিদেশি শাসন-শোষণের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে 'পরাধীনতা অপমানের জ্বালা সংক্রামিত করেন তাঁর অন্তরে'। 'Nandalalji young mind was deeply agitated by these discussions to which may be traced the begining of his sympathy for the revolutionaries of Bengal.' আর্ট স্কুলে প্রবেশের পূর্বে কলেজে পড়ার সময়ই নন্দলাল বিবাহিত। সেই কারণে স্ত্রী পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধের জন্যই তিনি বিপ্লবী দলে নাম না লেখালেও বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধা সহানুভূতি বজায় ছিল। আর্ট স্কুলে ভর্তির সময় অবনীন্দ্রনাথকে যে ছবি দেখিয়েছিলেন তার ভিতরে ক্ষুদিরামের ফাঁসির ছবি ছিল— এ তথ্য অবশ্য মেনে নেওয়া যায় না কারণ আর্ট স্কুলে ভর্তির সাল ১৯০৫ আর ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয় ১৯০৮। হতে পারে ১৯০৮-৯ সালে এমন একটি ছবি এঁকে অবনীন্দ্রনাথকে দেখিয়েছিলেন।

বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টায় নিবেদিতার প্রভাব, সহানুভূতি ছিল কিন্তু আর্ট স্কুলের ছাত্র নন্দলাল, সুরেন গাঙ্গুলী, অসিত হালদার এ ধরনের কোনো আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ুক এ তিনি চাননি— অসিত হালদার লিখেছেন, 'আমি এবং নন্দলাল প্রায়ই তাঁর

নিকট বাগবাজার যেতাম।... আমাদের উপদেশ ছেলে বার বার সাবধান করতেন আমরা যেন আর্ট ছেড়ে পলিটিক্সে যোগ না দি। আমাদের হাতে দেশের অবলুপ্ত আর্টের নব জাগরণ নির্ভর করছে— সেটাও দেশের জাগৃতি ও স্বাধীনতার পক্ষে খুব বড় কাজ। আমাদের বারবার উপদেশ দিতেন জাতীয় শিল্পকলার ঐশ্বর্যকে জাগিয়ে ও বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ কাজ করতে।' নিবেদিতার সংস্পর্শে নন্দলাল রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ভাবধারায় দীক্ষিত হন, নিবেদিতার চেষ্টাতেই তাঁর অজন্তা যাওয়া হয়, তার চাইতেও বড়ো কথা বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন বিপ্লবীদের সশস্ত্র আন্দোলনের কালে ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও নিবেদিতার প্রেরণায় তুলি-কলমকে আঁকড়ে থেকেছেন। অবশ্যই মাঝে মাঝে প্রশ্ন জেগেছে দ্বিধা জেগেছে— 'বারবার তিনি দোটানায় পড়েছেন ছবি এঁকেই যে বহির্জগতে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করা, তার অধীনতা পাশ ছিন্ন করবার জন্য জনমত জাগ্রত করা সম্ভব— এ বিশ্বাস তাঁর মনে যতদিন না বদ্ধমূল হয়েছে ততদিন তাঁর অস্বস্তির সীমা ছিল না'। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন ও চরকা, সূতা কাটার উপর গুরুত্বদানকালে নন্দলালও শান্তিনিকেতনে চরকা ও সূতা কাটায় উৎসাহী হয়েছিলেন যদিও শিল্প সম্বন্ধে গান্ধীজির মতামত তার মনে কিছু দ্বিধা, প্রশ্ন জাগিয়েছিল। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেন, 'গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে এলে নন্দলাল বসুর সঙ্গে তাঁরা গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। নন্দলাল বসুর ছাত্রদের নিয়ে গান্ধীজি— সাক্ষাৎ নিছক সৌজন্য সাক্ষাৎ ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল পরাধীন ভারতে, এই স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালে আর্টের কোনো প্রয়োজন নেই গান্ধীজি বলেছেন, এমন এক জনশ্রুতিকে খোদ গান্ধীজির কাছ থেকেই জেনে নেওয়া। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'কথা প্রসঙ্গে নন্দবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, শুনতে পাই আপনি নাকি বলেছিলেন বর্তমান ভারতে আর্টের কোনো প্রয়োজন নেই, আপনি এ কথার দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন? তিনি কোনো কথা না বলে ধীরে ধীরে তাঁর বাম পাশের উন্মুক্ত জানলার ভিতর দিয়ে খোলা প্রান্তরের পশ্চিম দিগন্তে অস্তগামী সূর্যের রঙিন আভার রঙিন আকাশের দিকে কিছুক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সেইখান থেকে চোখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, "দেখ আমি যদি এইখানে বসে এমন সুন্দর সূর্যাস্ত দেখতে পাই তবে সূর্যাস্তের একখানা ছবি এঁকে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখার কি প্রয়োজন আছে?" যদিও এই প্রশ্নের উত্তরে শিল্পী হিসাবে অনেক কথা বলা যেত, নন্দবাবু কিন্তু তাঁর সঙ্গে কোনো প্রকার তর্কাদি করেননি, সামান্যভাবে কিছু আলোচনা করেন'— [প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনীতে লিখেছেন ১৯২০ এবং ১৯২৫-এ গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে আসেন। যদিও ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ কস্তুরবারকে বলেছেন এবং প্রভাত কুমার ১৯১৫-র পর গান্ধীজি সস্ত্রীক ১৯৪০-এ শান্তিনিকেতন আসেন লিখেছেন তবুও নন্দলাল এবং গান্ধীজির এ সাক্ষাৎকার, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণর 'গুরুদেব তখন শান্তিনিকেতন ছিলেন না'-র ভিত্তিতে ১৯২০ সেপ্টেম্বর ধরা যায়]— বলা বাহুল্য গান্ধীজির উক্তিতে শিল্পী নন্দলাল, গান্ধীজিকে শিল্প সম্বন্ধে আঁকড়ে ধরার মতো কোনো আশ্রয় পাননি। সমস্ত শ্রদ্ধা সত্ত্বেও গান্ধীজির শিল্প সম্বন্ধে মতবাদে তাঁর সন্দেহ দীর্ঘকাল বজায় ছিল। এমনকী গান্ধীজির আহ্বানে কংগ্রেস অধিবেশন সজ্জার প্রাক্কালে ওয়ার্ধাতেও গান্ধীজিকে প্রশ্ন করেছিলেন এ বিষয়ে— 'আমি তখন সাহস করে গান্ধীজিকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম কারণ সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তিনি আর্টকে খুব উঁচু স্থান দেন কিনা সে বিষয়ে আমার মনে তখনও একটু সন্দেহ ছিল।' বিনোদ বিহারী তাঁর আধুনিক শিল্প শিক্ষায় লিখেছেন শিল্পী নন্দলাল বার বার অনুসন্ধান করেছেন শিল্প সম্পর্কে গান্ধীজির মতামত কারণ শিল্প সম্পর্কে গান্ধীজির মতামত সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ থাকায় শিল্পীরূপে তাঁকে অনুসরণ-এর পথ দীর্ঘকাল খুঁজে পাননি। শিল্প সম্বন্ধে গান্ধীজির মতামত আগে থেকে কানাঘুষোয় শোনা থাকলেও, শান্তিনিকেতনের সাক্ষাৎকার থেকে তা উপলব্ধিতে এল ১৯৩৪ সালে ওয়ার্ধায় সীমান্ত গান্ধী ও গান্ধী সাক্ষাৎকারে কলাভবনের ছাত্র— সীমান্ত গান্ধীর পুত্র প্রসঙ্গ ওঠে। শিক্ষাবিদ নৃতত্ত্ববিদ নির্মলকুমার বসু ও কৃষ্ণ কৃপালনী সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। গনি খানের বিশেষ ঝোঁক ভাস্কর্যে, নন্দলাল তাই অন্য কোথাও গনি খানের শেখার কথা বলেছিলেন, কৃষ্ণ কৃপালনী একথা জানালে গান্ধীজি বলেন, 'না, নন্দলাল ভাস্কর্যের মর্মকথা জানেন, তাঁর কাছ থেকেই গহ্নিকে তা আত্মসাৎ করতে হবে'। ১৯৩০-এ করা লিনোকাট-এ গান্ধীর ছবি অথবা ১৯৩০-এ করা টেম্পেরায় ডাণ্ডি অভিযানের ছবি গান্ধীজি দেখে থাকতে পারেন— তা থেকেও এমন ধারণা হওয়া অসম্ভব নয়। ১৯৩৫-এর মে জে সি কুমারাপ্পা শান্তিনিকেতন আসেন, নন্দলালের 'শ্যামলী' নির্মাণের খবর গান্ধীজির কাছে পৌঁছে ছিল, কুমারদা এ সম্পর্কেও বিশেষ খোঁজখবর নেন। এর কিছুকাল পরেই লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস অধিবেশনে শিল্পকলা প্রদর্শনীর আয়োজন হয়— আমাদের মনে হয় গান্ধীজির প্রতিনিধিকে রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র গ্রামীণ কুটির শিল্প নয়, লুপ্তপ্রায় অথচ পুনরুজ্জীবন সম্ভব এমন লোকশিল্প এবং শিল্পকলা নিদর্শন সম্পর্কে অবহিত করেন। এবং স্পষ্টতই গান্ধীজির অবগতির জন্য— 'Please tell Mahatmaji to consider that art is not a luxury of the well-to-do. The poor man needs it as much and employs it as much in his cottage-building, his pots, his floor-decoration his clay deities and in many

other ways. If Mahatmaji's men go round collecting specimens of village industries why may they not also look for and collect specimens of the various indigenous arts spread all over our land and waiting to be recherished?' —আমাদের শিল্পকলা সম্পদ যে বিদেশে যেয়ে জমা হচ্ছে এবং আগামীতে বিদেশে যেয়ে নিজ-দেশ-সম্পদ-এর পরিচয় নিতে হবে এ কথাও রবীন্দ্রনাথ বলেন;— এই আলোচনা গান্ধীজির শিল্পভাবনায় স্পষ্ট প্রভাব ফেলেছিল এবং তিনি লোকশিল্প ও ভারত শিল্পকলার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হন।

মগনবাড়ি তৈরির জন্য গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে নন্দলালকে নিয়ে যেতে কুমারাপ্পা ও প্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠান। রবীন্দ্রনাথ সেবার নন্দলালকে না ছাড়ায় স্থপতি সুরেন্দ্র কর যান। গান্ধীজি অবশ্য এর পর লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য নন্দলালকে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। ১৯৩৬-এর এই অধিবেশনের আগেই নন্দলাল যে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থক এবং গান্ধী অনুরাগী এ সংবাদ সম্ভবত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মারফত গান্ধীজির কাছে পৌঁছেছিল। অসহযোগ আন্দোলন ও গান্ধীজি এবং কংগ্রেস অধিবেশন ও গান্ধীজি প্রসঙ্গে তথ্যের জন্য আমরা নির্ভর করছি নন্দলাল-শিষ্য কবি-শিল্পী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তথ্যের ওপর। দেশ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ওয়ার্ল্ড উইন্ডো পত্রিকায় প্রভাতমোহন যে প্রবন্ধগুলি লিখেছেন এবং একাধিক বার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে এই মানুষটির স্মৃতিশক্তি, নানা দলিল-ফটোগ্রাফ-চিঠিপত্র সংগ্রহ যা দেখেছি, সর্বোপরি এই মানুষটির ঐতিহাসিক সততা নিষ্ঠা, ভক্তিতে গ্রাস হয়নি দেখেই আমরা তাঁর তথ্যকে গুরুত্ব দিচ্ছি। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক শিল্পশিক্ষার ৮৩-৮৬ পৃষ্ঠাও গান্ধীজি নন্দলাল সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য রচনা— আমরা সেটির সাহায্যও নিয়েছি।

নন্দলাল যে বার বার মোটা মাইনের চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে অভাব-অনটন সত্ত্বেও শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেননি, তার মূলে দেশপ্রেম ছিল; শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রপ্রীতি তো ছিলই কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর কলাভবন-এর মাধ্যমে ভারতগৌরব বিশ্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর ওপর সে ব্যাপারে আস্থাশীল— এ চিন্তা তাঁকে ব্যক্তিগত উন্নতিকে তুচ্ছজ্ঞান করতে শিখিয়েছে। সাংসারিক কারণে এবং কলাভবনের জন্য সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও ছাত্র, সহকর্মী কেউ অংশগ্রহণ করলে তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। ছাত্র প্রভাতমোহন তাই মহিষবাথানে আইন অমান্য সত্যাগ্রহ আন্দোলনে গেলে নন্দলাল যেন নিজে যোগ দেওয়ার আনন্দ পেয়েছেন। সেইসঙ্গে উপদেশ দিয়েছেন লক্ষ্মীছাড়া দেশে লক্ষ্মীশ্রী আনবার; গ্রামীণ শিল্পীদের সঙ্গে মিশবার উপদেশ দিয়েছেন। মহিষবাথান থেকে কলকাতায় যেয়ে প্রভাতমোহন সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তর সত্যাগ্রহ সংবাদের মুদ্রাকর হন— তখন বড়ো বড়ো পত্রিকা রাজরোষে বন্ধ। গান্ধীজির ডাণ্ডি অভিযান-এর প্রথম রেখাচিত্রটি নন্দলাল এঁকে দিলে সেটি সাইক্লোস্টাইলে ছাপা হয়। পরে এটির নানা রূপান্তর ঘটান নন্দলাল, নানা মাধ্যমে। চব্বিশ পরগনার গ্রামাঞ্চলে রাজবিদ্রোহ ও বিদেশি পণ্য বর্জন সম্পর্কে প্রচারের জন্য কয়েকটি পোস্টার এঁকে দিতে বললে নন্দলাল প্রভাতমোহনকে পাঁচটি বড়ো কার্টুন জাতীয় রেখাচিত্র এঁকে দেন। এমন একটি ছবির শিরোনাম 'হাড় খাব মাস খাব চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাব'— এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অন্য সম্প্রদায়কে লেলিয়ে দিয়ে ইংরাজ যে তার শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখছে— সাধারণ মানুষকে, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ফলে যে ইংরাজই লাভবান হচ্ছে এটা বুঝিয়েছিলেন। এমন একটি ছবিতে গান্ধীজি ছিলেন 'সমুদ্রবেষ্টিত এক দুর্গ প্রাকারে গান্ধী অঙ্গুলি সংকেতে বলছেন ফিরে যাও,— জলে, পিঠে পণ্য সম্ভার নিয়ে ইংরাজ জাপানি বণিক হাবুডুবু খাচ্ছে। প্রভাতমোহন এগুলির বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন নানা প্রবন্ধে।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস অধিবেশন (১৯৩৬ মার্চ)-এ সভামণ্ডপসজ্জা ও প্রদর্শনীর ভার দিয়েছিলেন গান্ধীজি নন্দলালকে। বিনোদ বিহারী লিখেছেন কংগ্রেস ছিল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনীতিজ্ঞদের মেলামেশার স্থান— লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে নন্দলালকে আহ্বানের মধ্য দিয়ে শিল্পীসমাজের সঙ্গে রাজনীতিজ্ঞদের মেলবন্ধন ঘটল এবং 'নন্দলাল হলেন যোগসূত্র স্থাপনের প্রধান ও প্রথম প্রতিনিধি'। লক্ষ্ণৌর শিল্প প্রদর্শনীতে প্রাচীনকাল থেকে সমসাময়িক যুগের চিত্রকলার নমুনা ছিল, ছিল ভাস্কর্য, স্থাপত্যের ফটোগ্রাফ। ফৈজপুর অধিবেশন (ডিসেম্বর ১৯৩৬)-এও নন্দলালকে চাইলেন গান্ধীজি। যেহেতু গ্রামবাসীদের জন্যই গ্রামে এই অধিবেশন স্থান নির্দিষ্ট সেহেতু গ্রামবাসীদের কথা ভেবেই গান্ধীজি এই নগর নির্মাণ ও সভামণ্ডপ, প্রদর্শনী, তোরণ ইত্যাদিকেও গ্রামীণ সংস্কৃতির ছাপ এবং গ্রামে উৎপন্ন বা সহজলভ্য উপাদানে সমস্ত কিছুই তৈরি করতে বলেন— আর্থিক অসুবিধার কথাও অবশ্য গান্ধী জানিয়েছিলেন— নন্দলাল, গ্রামীণ পরিবেশ ও উৎপন্ন দ্রব্য, বিশেষভাবে অধিবেশনের আগেই দেখে যাওয়াতে অসাধ্য সাধন করেছিলেন। 'খেড়াতিল কারাগরি'-তে বিভিন্ন প্রদেশের লোকশিল্পের নানা নিদর্শন ছিল। তোরণ ইত্যাদিতে বাঁশ খড় চাটাই ব্যবহার করেছিলেন— 'দেশের মাটির সঙ্গে নন্দলালের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। গ্রামের পরিবেশ অথবা গ্রাম্য কারিগরদের অবদান সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এই কারণে

ফৈজপুর কংগ্রেস সজ্জার পরিকল্পনা স্থানীয় উৎপন্ন জিনিসের সাহায্যে অনায়াসে সজ্জিত করতে সক্ষম হন। তাঁর শিল্পবোধের বিশেষ পরিচয় এই সময় তিনি বৃহত্তর সমাজের সামনে উপস্থিত করতে সক্ষম হলেন।' ফৈজপুর পুর কংগ্রেস-তিলকনগর সাজসজ্জা গান্ধীজিকে কী পরিমাণ মুগ্ধ করেছিল তাঁর ভাষণে তার পরিচয় ধরা আছে।

১৯৩৮ ফেব্রুয়ারি 'হরিপুরা কংগ্রেস নন্দলালের অন্যতম কীর্তি'— হরিপুরা কংগ্রেস সজ্জা প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হরিপুরা পোস্টার নামে খ্যাত নন্দলালের তিরাশিটি (বা ৮১টি) ছবি। (এবং ছাত্রদের করা শতাধিক প্রতিলিপি)। 'কর্মরত সজীব গ্রাম্যজীবন এই চিত্রাবলির প্রধান বিষয়। আঙ্গিকের দিক দিয়ে ছবিগুলি উজ্জ্বল রঙের প্যাটার্ন এবং ক্ষুরধার ক্যালিগ্রাফিক লাইন সমবেতভাবে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে তা সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে স্পর্শ করতে, আন্দোলিত করতে সক্ষম।

ফৈজপুর কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির রথের বলদ খুলে নেওয়াতে তা মুখ থুবড়ে পড়ে। গান্ধীজি লক্ড়ি উকড়ি কিছু দিয়ে রাতারাতি বলদগুলি তৈরি করতে বলেছিলেন— নন্দলাল পারবেন এ আস্থা তার অধিবেশন সজ্জা দেখে মনে হয়েছিল— ছাত্রদের সহায়তায় চাটাইয়ে রং দিয়ে যে বলদ তৈরি হয়েছিল মুগ্ধ বিস্মিত গান্ধীজি 'নন্দলালজি তো জাদুগর হ্যায়' বলেছিলেন। হরিপুরার আগে স্থান-পাত্র দেখতে এসেছিলেন নন্দলাল আগেই। সেবার তাঁর অসুস্থতার জন্যই গান্ধী সমুদ্রতীরবর্তী টিথল-এ নিয়ে যান। এই টিথলে রং এর অভাবে গান্ধীজির কথামতো নানা রঙের মাটি দিয়ে নন্দলাল ছবি আঁকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে স্বদেশপ্রেমিক নন্দলাল অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-র কথামতো নেপালি হাতে তৈরি কাগজে ছবি আঁকতে শুরু করেন, পরবর্তীকালে তাঁর অনেক বিখ্যাত ছবিই এই কাগজে আঁকা। আর স্বদেশি আন্দোলনকালে, বিলাতি দ্রব্য বর্জনের কালে, স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহারের কালে তিনি দেশি রং-মাটি পাথর থেকে রং তৈরি করে ব্যবহার করেন। এমনকী ভিন প্রদেশীয় ছাত্রীকে দিয়ে 'জৈন শাস্ত্র থেকে বর্ণ প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে তথ্য আহরণ ও রং প্রস্তুত করতে উৎসাহিত করেন'। তাঁর 'শিল্পচর্চা' গ্রন্থের রং পরিচ্ছেদে তিনি দেশি রং প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা করেছেন (পৃ. ৪-১২)। প্রভাতমোহন লিখেছেন, 'উইনসর নিউটনের বিদেশী রঙ আমরা আগে বেশির ভাগ ছবিতে ব্যবহার করতুম, ঐ সময় থেকে কলাভবনে দেশী পাথর মাটির রঙ ব্যবহারের প্রবর্তন হয়।'

'গান্ধী পুণ্যাহে ছেলেদের নিয়ে নন্দলাল প্রতিবছর নালা নর্দমা পাইখানা সাফ করেছেন'। নন্দলাল কিন্তু হরিপুরা কংগ্রেসের পর কংগ্রেস অধিবেশন সজ্জায় নিজে যাননি— ছাত্ররা গেলে নকশি ছবিতে এঁকে সাহায্য করেছেন। গান্ধীজির প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা অটুট থাকলেও হরিপুরাতে সুভাষচন্দ্রের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে মনে করেই— অন্যায়ের সঙ্গে আপোশ করেননি। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন 'স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দীপনা আজীবন তাঁর রক্তে সঞ্চারিত ছিল। আইএনএ-র যখন জয়জয়কার সে বছর সুভাষ বসুর জন্মদিনে সুভাষবাবুর একটি ক্ষুদ্রাকার ছবি বুকে ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন।'

অবনীন্দ্র যেমন একদিন মামির বাড়ির (গুণ্ডিচা বাড়ি)। ভাস্কর্য টালি দিয়ে ছেয়ে দেওয়া থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন, নন্দলাল তেমনি পুরী ভুবনেশ্বর বিশেষকরে কোনার্কের বন্ধকাম মিথুন মূর্তি— ভারত শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শনকে বাঁচিয়ে ছিলেন। নন্দলাল বসু তাঁর শিল্পকথাতে খুলে না লিখলেও লিখেছেন 'কিছুকাল পূর্বে পুরী ও কোনারকের মন্দিরের বহির্ভিত্তিস্থিত বন্ধকাম মূর্তিগুলি নষ্ট করবার কথা হয়েছিল। অত্যন্ত সাংঘাতিক প্রস্তাব! ঐগুলি গেলে শিল্পসৃষ্টির কতকগুলি শ্রেষ্ঠ নিদর্শনই চলে যায়'। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত লেখায় দেখি এই 'সাংঘাতিক প্রস্তাব' এসেছিল গান্ধীজির কাছ থেকে। প্রভাতমোহনও লিখেছেন কোনার্কের মূর্তিগুলি গান্ধীজির চক্ষুশূল ছিল। যমুনালাল বাজাজ চুন-বালির আস্তর দিয়ে ঢেকে দেওয়ার খরচ দিতেও তৈরি। গান্ধীজির মনে হয়েছিল নন্দলাল বসুকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার। নন্দলালের তীব্র আপত্তিতে কোনার্ক রক্ষা পায়। এই ঘটনা থেকে শিল্প সম্বন্ধে নন্দলালকে গান্ধীজি কতটা মর্যাদা দিতেন, গুরুত্ব দিতেন বোঝা যায়। নিজের ধ্যানধারণা যাই হোক না কেন, যেহেতু এটা শিল্পবস্তু, সেখানে নন্দলালই চূড়ান্ত। তাঁর মতামত সিদ্ধান্তই সিদ্ধান্ত। আর নন্দলাল আরাই কাম্পুর সঙ্গে কোনার্ক পরিদর্শনকালে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখেছেন এই শিল্পসম্ভার। তাঁর বিশ্বাস 'রস সৃষ্টি হিসাবে উক্ত মূর্তিগুলি খুবই উচ্চশ্রেণীর'— গান্ধীজির ইচ্ছা অনিচ্ছা জানা থাকলেও মূহূর্তমাত্র দ্বিধা করেননি। শিল্পী বলে, রসিক বলে এবং দেশপ্রেমিক বলে— দেশের চাইতে দেশনেতা সেখানে বড়ো হয়ে ওঠেনি।

বিজ্ঞান বনাম বিজ্ঞানী

মানস প্রতিম দাস

বিজ্ঞানের চলার পথ মসৃণ নয় কোনোদিনই। চেনা রীতি, অভ্যস্ত ছন্দকে ভাঙার কাজ করে এসেছে বিজ্ঞান। তাই বাধা পাওয়াতেই অভ্যস্ত মানুষের জ্ঞানচর্চার এই শাখা। কাউকে যদি এককথায় সেই বাধার উৎসকে চিহ্নিত করতে বলা হয় তবে সে ধর্মের নাম করবে এটাই প্রত্যাশিত। বাস্তবিকই তাই, যুগে যুগে ধর্মের অনুশাসন আর যাজক পুরোহিত-মৌলবিদের চোখরাঙানি সইতে হয়েছে সৎ বিজ্ঞানীদের। বহু যুগান্তকারী আবিষ্কারকে চেপে রাখতে হয়েছে ধর্মের কোপে পড়ার ভয়ে। এমন কাহিনি আমরা বহু বার শুনেছি, জেনেছি নানা দেশে ধর্মবেত্তাদের হাতে নিগৃহীত বা নিহত বিজ্ঞানীদের কথা। ফলে যুক্তিবাদী মানুষের মনে বিজ্ঞানের প্রতিপক্ষ হিসাবে প্রধান এবং হয়তো একমাত্র প্রতিপক্ষ হিসাবে ঠাঁই পেয়েছে ধর্ম। এই আখ্যানের মধ্যে আপাতভাবে কোনো ত্রুটি নেই, বিজ্ঞানের অগ্রগতির স্বার্থে ধর্মের ক্রুরতার হাড় হিম করা কাহিনি শোনানো দরকার বার বার। তবে নিরপেক্ষতার স্বার্থে এটাও মেনে নিতে হবে যে ধর্মই বিজ্ঞানের চলার পথে একমাত্র বাধা নয়।

বিজ্ঞানের যে সুবিশাল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে গত কয়েক শতাব্দী ধরে তার মধ্যে থেকেই বহু বার এমন বাধার প্রাচীর তোলা হয়েছে যা কোনো কোনো সময় দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। শুধুমাত্র নিজের অধিকারের জায়গা বজায় রাখতে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীরা অবজ্ঞা করেছেন, সর্বসমক্ষে বিদ্রূপ করেছেন তরুণ প্রতিভাকে। ফলে সম্ভাবনাময় বহু আবিষ্কার যেমন বাতিল হয়েছে তেমনি প্রতিভাবান আবিষ্কারকের জীবনে নেমে এসেছে মর্মান্তিক পরিণতি। ঘটনাগুলোর গতিপথ যে সবসময়ে অভিন্ন তা নয় কিন্তু পরিণতি মোটামুটি একই। অভিজ্ঞ পাঠক যে এমন উদাহরণের কথা জানেন না তা নয় তবে এখানেও সেই একই দোহাই পাড়তে হয়— বিজ্ঞানের অগ্রগতির স্বার্থেই এর আলোচনা হওয়া উচিত বারে বারে। মোক্ষম যে উদাহরণটা শুরুতেই উল্লেখের দাবি রাখে তা অবশ্যই লুডউইগ বোল্টজমানের (উচ্চারণের নিরিখে বানানটা হয়তো বোল্ৎজমান হতে পারত)।

বোল্টজমানের জন্ম অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে ১৮৪৪ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি এই সময়টা ইউরোপের বুকে ভাঙনের সময়। বহুকাল ধরে অক্ষত অস্ট্রো-হাঙেরীয় সাম্রাজ্য যেমন ভাঙছে তেমনি বিজ্ঞানের জগতে প্রতিষ্ঠিত ধারণাগুলো পড়ছে একের পর এক চ্যালেঞ্জের মুখে। অসীমের (infinity) ধারণা এবং Continuum Hypothesis উপহার দিয়ে গণিতে চাঞ্চল্য তৈরি করেছেন জর্জ ক্যান্টর। বোল্টজমানের যখন পনেরো বছর বয়স তখন Origin of Species লিখে জীবের সৃষ্টি সম্পর্কে বহু যুগ লালিত ধারণাকে প্রবল ধাক্কা দিয়েছেন চার্লস ডারউইন। এমনই একটা আবহে, মাত্র বাইশ বছর বয়সে ডক্টরেট শেষ করলেন বোল্টজম্যান। তাঁর বিষয় ছিল গ্যাসের গতিতত্ত্ব (Kinetic Theory of Gases), এর পরে অধ্যাপনার চাকরি পেলেন তিনি, প্রথমে ১৮৬৯ সালে গ্রাজ শহরে, পরে ভিয়েনায় ১৮৭৩ সালে এবং পরে ১৮৭৬ সালে আবার গ্রাজে। এর পরে আবার অবশ্য তিনি ভিয়েনা যান ১৮৯৪ সালে। এই শেষবার নিজের সহকর্মী হিসাবে তিনি পেলেন আর্নস্ট ম্যাককে। বিজ্ঞানের ইতিহাস এবং দর্শনের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন ম্যাক আর বোল্টজমান ছিলেন গণিতের অধ্যাপক।

আজকের দিনে যাকে বলা হয় Statistical Mechanics, পরিসংখ্যানভিত্তিক বলবিদ্যা, তার ভিত্তি স্থাপন করেন বোল্টজম্যান। তাঁর যাবতীয় তত্ত্বের বা সূত্রের মধ্যে নিহিত রয়েছে পরমাণু এবং অণুর ধারণা। পাঠক মাত্রেই জানেন যে সেই সময়ে পরমাণু ছিল অঙ্ক থেকে পাওয়া একটা ধারণা মাত্র, পরীক্ষার মাধ্যমে সেটার অস্তিত্ব নির্ধারিত হয়নি। আর্নস্ট ম্যাক ছিলেন সেই শিবিরের মানুষ যেখানে বিশ্বাস করা হত যে নিজের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্থাৎ চোখ-কান-ত্বক ইত্যাদি দিয়ে যা অনুভব করা যায় না তার অস্তিত্ব নেই। দর্শনের ইতিহাসে এই ভাবনার একটা পোশাকি নাম আছে— লজিক্যাল পজিটিভিজ্‌ম। এতে বিশ্বাস করা হয় যে সর্বসমক্ষে পরীক্ষার মাধ্যমে যে বিষয়কে প্রমাণ করা যায় না তা গ্রহণের যোগ্য নয়।

ম্যাকেরও বক্তব্য ছিল যে কেউ যখন দেখেনি পরমাণুকে অতএব তার অস্তিত্বই নেই। মানুষের ইন্দ্রিয় যা ধরতে পারে না তা বিজ্ঞানের পরিধিতে জায়গা পেতে পারে না, এই ছিল ম্যাকের দর্শন। ১৮৯৭ সালে ভিয়েনার ইম্পিরিয়াল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেসে বোল্টজমানের বক্তৃতার পর ম্যাক সরাসরি বলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন না যে পরমাণু বলে কিছু থাকতে পারে। যাঁরা জানেন তাঁদের হয়তো এখানে মনে পড়ে যেতে পারে ইংল্যান্ডের এক অনুরূপ ঘটনার কথা। সেখানে এভাবেই বিদ্ধ হয়েছিলেন এক তরুণ বিজ্ঞানী। ভারতীয় বংশোদ্ভূত সেই বিজ্ঞানীর নাম চন্দ্রশেখর সুব্রহ্মণ্যম। মহাকাশের অতি বিশাল নক্ষত্রের অভ্যন্তরে জ্বালানি ফুরিয়ে এলে যখন সংকোচন শুরু হয় তখন একটা পর্যায়ে এসে সেই সংকোচনের চাপ হয় বিপুল। সেই পরিস্থিতিতে পাউলির পরিবর্জন নীতি মেনে কণাদের যে আলাদা থাকার কথা তা আর সম্ভব হয় না। এই যে ব্যতিক্রমী অবস্থা তাকে চন্দ্রশেখর বলেন 'ডিজেনারেসি'। রয়্যাল সোসাইটির সভায় নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করার পর চন্দ্রশেখর দেখলেন যে খানিকটা রীতি ভেঙেই তাঁর উপস্থাপন সম্পর্কে মতামত জানানোর জন্য আহ্বান জানানো হল প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটনকে। যে এডিংটন একসময়ে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সপক্ষে প্রমাণ জোগাড় করে বিজ্ঞানকে নতুন দিশা দিয়েছিলেন সেই তিনিই এক সভায় চূড়ান্ত গোঁড়ামির নমুনা রাখলেন। চন্দ্রশেখরের বক্তব্যকে তাচ্ছিল্য করে বললেন, বিশ্বে নিশ্চয়ই কোথাও একটা নিয়ম থাকবে যাতে এই ডিজেনারেসি বন্ধ হয় এবং নক্ষত্রগুলো অটুট থাকে। আসলে নক্ষত্রের মৃত্যুর পর সেগুলো শ্বেত বামনে পরিণত হয়, এই অবধি জানা ছিল তখনকার বিজ্ঞানীদের। ভারী নক্ষত্রদের ক্ষেত্রে যে এর থেকেও বেশি সংকোচন হতে পারে এবং অন্য কিছু পরিণতি সম্ভব তা মানতে নারাজ ছিলেন এডিংটনের মতো বিজ্ঞানীরা। ফলে চন্দ্রশেখরের মতো তরুণ বিজ্ঞানীকে হেয় করতে একটুও বাধেনি এই রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমারের। ক্ষমতাসীন বিজ্ঞানীর এই অবজ্ঞা যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে কয়েক দশক পিছিয়ে দিয়েছিল তা আজ আমরা সবাই জানি।

বোল্টজমানের আবিষ্কার সম্পর্কে আর্নস্ট ম্যাকের মনোভাব যে একইরকম ক্ষতি করেছিল বিজ্ঞানের জগতে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটা আমাদের ভালোই জানা যে প্রতিষ্ঠিত এবং খ্যাতিমান কোনো বিজ্ঞানী যখন কোনো নতুন ভাবনাকে আমল দিতে গররাজি হন তখন প্রতিষ্ঠায় তাঁর থেকে পিছিয়ে থাকা অধিকাংশ বিজ্ঞানী অনুরূপ আচরণ দেখান। ফলে আমরা আন্দাজ করতে পারি যে ম্যাকের মন্তব্য বোল্টজম্যানের পক্ষে কতটা প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন তাঁর চারটে যুগান্তকারী গবেষণাপত্রের একটাতে দেখান যে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে ধরা না দিলেও পরিসংখ্যানের বিচ্যুতির বিচারে পরমাণুর অস্তিত্ব বোঝা সম্ভব। কিন্তু তাতে বোল্টজম্যানের কাজের স্বীকৃতি তৈরি হয়নি। সত্যি বলতে কী, একসময় আইনস্টাইন নিজেও প্রভাবিত হয়েছিলেন ম্যাকের তত্ত্বে। স্থান ও কাল নিয়ে নিউটনের ভাবনাকে আক্রমণ করেছিলেন ম্যাক। আইনস্টাইনের প্রথমে মনে হয়েছিল যে এই সমালোচনা সঙ্গত কিন্তু পরে তিনি বোঝেন যে বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি নিয়ে অতটা মাথাব্যথা নেই ম্যাকের। তিনি কেবল নিউটনের দর্শনকে আক্রমণ করছেন। যাই হোক, ফিরে আসি বোল্টজমানের দুরবস্থার কথায়। ম্যাক এবং তাঁরই মতো আর একজন বিজ্ঞানী, উইলহেল্ম অস্টওয়াল্ডের বিরোধিতার ফল হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলেন বোল্টজমান। পদার্থবিজ্ঞানের এক নামী জার্নালের সম্পাদক তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে তাঁর জার্নালে আর যাই লিখুন বোল্টজমান, পরমাণু তত্ত্ব সম্পর্কে কোনো কথা লিখতে পারবেন না। নিজের অবস্থান বাঁচিয়ে একটা আপোশের জায়গায় পৌঁছোনোর চেষ্টা করেছিলেন বোল্টজমান যেখানে পরমাণু তত্ত্বের সপক্ষের এবং বিপক্ষের বিজ্ঞানীরা একসঙ্গে কাজ করতে পারেন। কিন্তু এতেও মন গলল না তাঁর সমালোচকদের। ফলে সব মিলে গভীর এক অবসাদে ভুগতে শুরু করলেন স্ট্যাটিসটিক্যাল মেকানিক্সের জনক।

শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ১৯০১ সালে অবসর নেন ম্যাক। বোল্টজমান অধ্যাপনা করতে গিয়েছিলেন লিপজিগে অস্টওয়াল্ডের আমন্ত্রণে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরোধী হলেও অস্টওয়াল্ড ছিলেন বোল্টজমানের বন্ধু। ১৯০২ সালে ভিয়েনায় ফিরলেন বোল্টজমান। এবার তিনি ঠিক করলেন যে তাঁর তত্ত্বের বিরুদ্ধে যেসব দার্শনিক আপত্তি তোলা হয়েছে তার মোকাবিলা করতে তিনি নিজেও দর্শনচর্চার পথ ধরবেন। ১৯০৩ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন অস্ট্রিয়ান ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটি। পাশাপাশি তিনি পদার্থবিজ্ঞান এবং দর্শন পড়াতে শুরু করলেন একইসঙ্গে। এবারে তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়ল এবং এমনকী রাজ দরবারেও তাঁর ডাক পড়ল সসম্মানে। কিন্তু বিজ্ঞানের জগতে তখনও তিনি ব্রাত্য। সেন্ট লুই শহরে এক সম্মেলনে যখন তাঁর তত্ত্বকে বাতিল করছেন বহু বিজ্ঞানী তখন নিজের ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেলেন না বোল্টজমান। তাঁকে কেউ আমন্ত্রণ জানালেন না সেই সম্মেলনে। এমন ঘটনার ধারাবাহিকতায় ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে লাগলেন বোল্টজমান। অবশেষে পরিবারের সঙ্গে ইতালির ত্রিয়েস্তে শহরে ছুটি কাটানোর সময় ১৯০৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর আত্মহত্যা করলেন তিনি। মাত্র বাষট্টি বছর বয়সে শেষ হয়ে গেলেন বিজ্ঞানের এক বিরল প্রতিভা। যে মানুষ আমাদের

দেখিয়ে গিয়েছেন গ্যাসের মধ্যে থাকা পরমাণুর ছোটাছুটির সঙ্গে তাপমাত্রার সম্পর্ক, যিনি আমাদের দিয়েছেন এই মহাবিশ্বে বিশৃঙ্খলার সূচক হিসাবে এনট্রপির ধারণা, তাঁকে চলে যেতে হল বিজ্ঞানীদের গোঁড়ামির কাছে হার মেনে। বিজ্ঞান এখানে হারল বিজ্ঞানীর ইগোর কাছে। রুদ্ধ হল বিজ্ঞানের অগ্রগতি।

বিরোধিতা সহ্য করতে না পেরে আক্রান্ত সব বিজ্ঞানী যে নিজের জীবন শেষ করে দেবেন তা তো নয়। কিন্তু এটাও ঠিক যে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যুঝে উঠতে না পেরে অনেক বিজ্ঞানীকেই পিছু হঠতে হয় সাময়িকভাবে। নব্য ধারণার প্রতি এই যে বিরোধিতা তার অনেক কারণ থাকতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো দেখা গেল যে চলতি মডেলের সাহায্যে নতুন একটা ধারণা ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। অথবা পরীক্ষামূলক ফলাফল সন্তোষজনক হলেও আঙ্কিক বিশ্লেষণ না থাকায় সেটা মনঃপূত হল না অনেকের। তখন আরো অনুসন্ধানের বদলে প্রতিষ্ঠান নতুন তত্ত্বকে বাতিল করার দিকে ঝুঁকে পড়ে। উনবিংশ শতকে তড়িৎচুম্বকত্বের নানা তত্ত্বকে পড়তে হয়েছিল এমনই বাধার সামনে। ধরা যাক মাইকেল ফ্যারাডের কথা। যে পরিবারে জন্ম ফ্যারাডের তাদের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। ফলে প্রথম দিকে কিছুটা পড়তে-লিখতে শেখা বা প্রাথমিক গণনা শেখার বাইরে চলতি ধারায় বেশি কিছু শেখা হয়নি তাঁর। কিন্তু অসাধারণ উদ্যমী ফ্যারাডে নিজের শিক্ষিত করে তোলেন বই পড়ে। এমনকী বিজ্ঞান-লেখক টমাস সিম্পসনের মোটে ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান তৈরি হয় এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার একটা প্রবন্ধ পড়ে। তবে গণিতে তিনি ততটা শিক্ষিত ছিলেন না। বলা যেতে পারে গণিতের প্রতি তাঁর মনোভাব বিরূপ থাকায় স্বশিক্ষার সিলেবাসে সেটাকে ঢোকাননি। বিজ্ঞানী নিজে চোখে যা দেখছেন সেটাই ফ্যারাডের কাছে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনা আর বিজ্ঞানীর মাঝে গণিত ঢুকে গোলমাল বাধাক, এটা একেবারেই কাঙ্ক্ষিত ছিল না তাঁর। তড়িৎচুম্বক ক্ষেত্রের বলরেখাকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন শব্দের সাহায্যেই। এই বলরেখার ধারণাকে প্রসারিত করেই তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্র বা electromagnetic field সম্পর্কিত ধারণা আনেন ফ্যারাডে। তবে তিনি যেভাবে বলরেখা বরাবর কাছাকাছি থাকা কণার কল্পনা করেন তা আজ আর সমর্থিত নয়। Action at a distance, তৃতীয় কোনো বস্তু বা মাধ্যমের মধ্যস্থতা ছাড়াই যে এক বস্তু অন্য আর একটা বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করতে পারে এটা ফ্যারাডে মানতেন না। যাই হোক, পরিণত বয়সে নিজের তত্ত্ব উপস্থিত করেছিলেন তিনি। ফলে সেই তত্ত্বের প্রতি বিরোধিতাকে অসহায়-নবীনের-ভাবনার-প্রতি-আঘাত জাতীয় কোনো সেন্টিমেন্টাল আখ্যা দেওয়া চলে না। তিনি যে সময় কাজ করছিলেন সেই পর্বে নিউটনের দেওয়া বলবিদ্যা এবং গণিত প্রভাবিত করে রেখেছিল বিজ্ঞানীদের। ফলে ফ্যারাডের তত্ত্বে গণিতের অনুপস্থিতি দেখে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা তাচ্ছিল্য করার সুযোগ ছাড়তে চাননি। তা ছাড়া ওই action at a distance বুঝতে না পারার দায়ও চাপানো হয়েছিল তাঁর উপর। এমন একটা জায়গায় ফ্যারাডের পক্ষ অবলম্বন করলেন বয়সে তাঁর থেকে চল্লিশ বছরেরও বেশি ছোটো জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল। ম্যাক্সওয়েলের জন্ম স্কটল্যান্ডে, ১৮৩১ সালে। সচ্ছল পরিবারের একমাত্র সন্তান তিনি, স্নাতক হলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা ট্রিনিটি কলেজ থেকে। মজার কথা এই যে, উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংল্যান্ডের শিক্ষাজগতে সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদির আধিপত্য থাকলেও ট্রিনিটি কলেজে সবথেকে বেশি গুরুত্ব পেত গণিতের শিক্ষা। বিশুদ্ধ এবং ফলিত গণিতে তাই প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন ম্যাক্সওয়েল। নিউটনীয় ক্যালকুলাসও আয়ত্ত করেছিলেন তিনি। ফ্যারাডের তত্ত্ব পাঠ করতে গিয়ে তিনি বেশ বুঝলেন যে গাণিতিক কাঠামো তৈরি করে তার সাহায্যে এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা সম্ভব। এ ব্যাপারে প্রথম যে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করলেন তিনি তার শিরোনাম ছিল On Faraday's Lines of Force. সেখানে তিনি বোঝালেন যে গাণিতিক উপস্থাপনার প্রয়োজন কোথায়, লিখলেন:

We must therefore discover some method of investigation which allows the mind at every step to lay hold of a clear physical conception, without being committed to any theory founded on the physical science from which that conception is borrowed, so that it is neither drawn aside from the subject in pursuit of analytical subtleties, nor carried beyond the truth by a favourite hypothesis.

মোট কথা, প্রত্যক্ষ করা ঘটনার থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়েও ঘটনা-নিরপেক্ষভাবে তত্ত্বের পরিবেশন। ম্যাক্সওয়েলের কাজের ফলে তৈরি হল কুড়িটা ক্ষেত্র সমীকরণ (field equations) যা থেকে পরবর্তীকালে অলিভার হেভিসাইড নিষ্কাশন করলেন মাত্র চারটে সমীকরণ। এগুলোই পরিচিত তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রের ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ হিসাবে। কিন্তু শুধু এই সমীকরণ দেওয়ার মধ্যেই ফ্যারাডের-পক্ষ-অবলম্বন সীমাবদ্ধ ছিল না। রয়্যাল ইনস্টিটিউশনের ১৮৭৬ সালের কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে এই সারস্বত প্রতিষ্ঠানের এক সভায় action at a distance ধারণার বিপরীতে গিয়ে ফ্যারাডের বলরেখার ধারণা দেওয়ার প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেন ম্যাক্সওয়েল। এভাবে প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা সত্ত্বেও ফ্যারাডে হেরে যাননি। ম্যাক্সওয়েলের মতো দূরদর্শী বিজ্ঞানী অচিরেই প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর কাজকে।

গণিত নিয়ে সাধারণভাবে ইংরেজদের প্রতিকূল মনোভাবের

কড়া সমালোচনা করেছিলেন অগাস্টাস ডি মর্গান (১৮০৬-১৮৭১)। ভারতে জন্মানো এই ব্রিটিশ গণিতজ্ঞের শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ হয়েছিল সেই ট্রিনিটি কলেজে। ১৮২৮ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ লন্ডনে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন তিনি। লন্ডন ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটির প্রথম সভাপতি মর্গান। স্বজাতির পণ্ডিতদের এক অংশ যেভাবে অঙ্ক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতেন তা মোটেই পছন্দ হত না মর্গানের। ১৮৪৫ সালে তিনি দেখান যে তাঁর দেশের জন কাউচ অ্যাডামস অঙ্ক কষে নেপচুন গ্রহের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু অঙ্কের উপর সে সময়ের ইংরেজদের ভরসা কম ছিল তাই অ্যাডামসের আবিষ্কারকে কেউ পাত্তা দেয়নি। অথচ এই ঘটনার আট মাস পরে ফ্রান্সের বিজ্ঞানী আরবেঁ লে ভেরিয়ার একইভাবে অঙ্ক কষে নেপচুনের উপস্থিতি সম্পর্কে জানান। ফরাসিরা অঙ্কের ব্যাপারে আস্থাবান হওয়ায় ফরাসিরা উৎসাহিত হল এই আবিষ্কারে। তাঁর কাজ প্রকাশিত হল অ্যাডামসের আগে। এক অর্থে অ্যাডামসের তুলনায় বিজ্ঞানের ইতিহাসে এগিয়ে রইলেন লে ভেরিয়ার। মাইকেল ফ্যারাডের ঘটনার বিপরীত এই ঘটনা দেখায় যে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের মতবাদের ধাক্কায় কত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবহেলিত হতে পারে নতুন বিজ্ঞানের উন্মেষ।

এই নিবন্ধের শেষ করব আর এক গণিতজ্ঞের বিরক্তি এবং তার থেকে উঠে আসা এক জার্নালের কথা দিয়ে। ভদ্রলোকের নাম কার্ল পিয়ার্সন। রয়্যাল সোসাইটির ফেলো এই ইংরেজ গণিতজ্ঞ আধুনিক পরিসংখ্যানবিদ্যার জনক। জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান প্রয়োগ করে তিনি biostatistics শাখার জন্ম দেন। কিন্তু সে বিষয়ে রয়্যাল সোসাইটির মুখপত্রে লিখতে গিয়ে তিনি পড়লেন সমস্যার মুখে। ১৯০০ সালের অক্টোবরে তিনি একটা গবেষণাপত্র পাঠান যেটা রয়্যাল সোসাইটি ছাপে পরের বছরের নভেম্বরে। গবেষণাপত্রের বিষয় ছিল জীববৈজ্ঞানিক সমস্যার ক্ষেত্রে গণিতের প্রয়োগ। এটা ছাপার আগে রয়্যাল সোসাইটির কাউন্সিলের একটা সিদ্ধান্ত জানানো হয় পিয়ার্সনকে। তাঁকে বলা হয়, ভবিষ্যতে জীববিজ্ঞানের প্রয়োগের ক্ষেত্র থেকে যেন গণিতকে আলাদা রাখা হয়। এই কথা শুনে এতটাই চটে যান পিয়ার্সন যে সোসাইটির ফেলোশিপ ত্যাগ করতে উদ্যত হন তিনি। কিন্তু বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস গ্যালটনের পরামর্শে সে যাত্রায় আর ফেলোশিপ ত্যাগ করেননি। তবে নতুন একটা জার্নাল শুরু করেন পিয়ার্সন যেখানে জীববিজ্ঞানে গণিতের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করতে কোনো বাধা থাকবে না। 'বায়োমেট্রিকা' নামের এই জার্নালের প্রথম ইস্যুর জন্য গ্যালটন একটা প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে তিনি বলেন যে জীববিজ্ঞানে গণিতের প্রয়োগকে উৎসাহ দেওয়া উচিত। সঙ্গে এও যোগ করেন যে পুরোনো পন্থার অনুসারীরা কখন স্বাগত জানাবে তার অপেক্ষা করে নতুন একটা বিজ্ঞান থেমে থাকতে পারে না। তাই বায়োমেট্রির একটা বিশেষ জার্নালের দরকার হয়ে পড়েছে। খেয়াল রাখতে হবে যে ভারতে পরিসংখ্যানবিদ্যার জনক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ বিলেত থেকে ফেরার আগে বায়োমেট্রিকার অনেকগুলো সংখ্যা সংগ্রহ করে এনেছিলেন। এই জার্নালই ছিল তাঁর অনুপ্রেরণা, দেশে পরিসংখ্যানবিদ্যা চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় উৎসাহ তিনি খুঁজে পান এখানেই।

বিজ্ঞানের অঙ্গনে এমন নৈরাজ্যজনক প্রতিক্রিয়া অমিল নয়। তবে কেউ যদি ভাবেন যে এর ফলে বিজ্ঞান কালিমালিপ্ত হয়েছে বা তার অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে তবে সিদ্ধান্তটা ঠিক হবে না মোটেই। এই ঔদাসীন্য অবহেলা আর অবিচার সয়েই এগিয়েছে বিজ্ঞান। আগের যুগের ভুল শুধরে এগোনোয় তার জুড়ি মেলা ভার। প্রচলিত ধারণার কারণে নতুন গবেষকের আজও যে নাভিশ্বাস ওঠে না তা নয়। তবে বিজ্ঞানের ইতিহাসের সুদীর্ঘ সময়কালে দেখা গিয়েছে যে দেরিতে হলেও সমর্থন জুটেছে সেই বিজ্ঞানের ভাগে যা প্রাকৃতিক ঘটনা বিশ্লেষণে অনেক বেশি সফল। পরিশ্রমী এবং মেধাবী বিজ্ঞানীকে উৎসাহে ভরপুর করে রাখে এই একটা দুরন্ত সত্য!

সাংবাদিক কার্ল মার্কস

সুরেশ কুণ্ডু

কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। এই দুই দার্শনিককে আমরা চিন্তাগত অভিন্ন সত্তার অপরিহার্য পরিণতি বলে ভাবি। এঁরা দুজনে ছিলেন সার্বিক অভিন্ন হৃদয়ের মানুষ। কার্ল মার্কসের আজীবন দার্শনিক সুহৃদ ও বৈপ্লবিক সহযোগী ছিলেন ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। এঙ্গেলস তাঁর দার্শনিক বন্ধু সম্পর্কে বলেছেন, মার্কস ছিলেন সর্বকালের এক বিস্ময়কর প্রতিভা। আমরা বলি, এই বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ও বিপ্লবী। জ্ঞানের তত্ত্ব আর প্রয়োগের সব্যসাচী। তাঁর সময়ে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ হোমোস্যাপিয়েন্স। তাঁর সময়ের পরেও অদ্যাবধি মানুষের চিন্তাজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার, সংগঠক ও পথপ্রদর্শক। পৃথিবীর আর কোনো রাজনৈতিক ও দার্শনিক ব্যক্তিত্ব নেই যিনি শতকের সীমা ছাড়িয়ে এত আলোচিত, এত অনুসৃত। এমন এক মানুষের সাংবাদিকতার কাজের বিশেষ দিকটা আমরা এই আলোচনায় রাখছি।

এই আলোচনার প্রাসঙ্গিকতার প্রয়োজনে এখানে আমরা মহান লেনিনের কিছু কথার উল্লেখ করছি। তিনি বলেছেন, 'মার্কসের সমগ্র প্রতিভাটাই এইখানে যে মানবসমাজের অগ্রণী ভাবনায় যেসব জিজ্ঞাসা আগেই দেখা দিয়েছিল মার্কস তারই জবাব দিয়েছেন। তাঁর মতবারের উদ্ভব হয়েছে দর্শন, অর্থশাস্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মহাচার্যেরা যে শিক্ষা দান করেছিলেন তারই সরাসরি অনুবর্তন হিসেবে।... উনিশ শতকের জার্মান দর্শন, ইংরেজি অর্থশাস্ত্র এবং ফরাসি সমাজতন্ত্ররূপে মানবজাতির যা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তার ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী হল মার্কসবাদ।

লেনিনের কথা অনুসরণ করে বলা যায় যে, মার্কসবাদের তিনটি অঙ্গ। সেগুলো হল, বস্তুবাদী দর্শন, অর্থনৈতিক তত্ত্ব এবং সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব। এই তিনটি হল মার্কসবাদের বিশ্ববীক্ষা। এই তিনটি অঙ্গের রাজনীতির অঙ্গটা প্রসারিত করতেই তিনি সাংবাদিকতাকে হাতিয়ার করে তোলেন। প্রসঙ্গত বলে রাখার বিষয় এটা যে, তিনি তাঁর বস্তুবাদী দর্শনটা প্রসারিত করেছেন তাঁর বৈজ্ঞানিক ভাবনায়। মার্কসের দার্শনিক চিন্তাটা হাতিয়ার করেই আমাদের বুঝতে হবে বিজ্ঞানের দর্শনটা।

তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা বা মতবাদটা ছিল উনিশ শতকের একটা সম্পূর্ণ নতুন মতবাদ। এই মতবাদটা প্রচারের প্রথম উদ্যোগ ছিল 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'। এটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের চিন্তাজগতে একটা ভূকম্প দেখা দেয়। তোলপাড় শুরু হয় গোটা বিশ্বে। দর্শনগত ও রাজনৈতিক বিরোধিতা তুঙ্গে উঠে যায়। মার্কস ভাবনার বিকৃত উপস্থাপনায় লেগে যান অসংখ্য দার্শনিক ও রাজনীতিক। মার্কস ও এঙ্গেলস অসীম ধৈর্যে এতসব বিরোধিতার জবাব দেন। তখনকার সময়ে বুলেটিন, লিফলেট এবং পুস্তক-পুস্তিকা ছিল মতাদর্শ প্রচারের হাতিয়ার। এই পন্থাগুলো সব মার্কস কাজে লাগিয়েছিলেন। উপরন্তু সংবাদপত্রেও তিনি মতাদর্শগত সংগ্রামে শামিল হলেন। সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রের সম্পাদক হিসেবে তাঁর এই অনন্য লড়াইয়ের কথা আমাদের জানতে হবে। বুঝতে হবে, এই সময়ের প্রেক্ষিতে এই মতাদর্শগত সংগ্রামের প্রাসঙ্গিকতা।

মার্কসবাদ হল বিপ্লবের বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানটা রাজনীতির ক্ষেত্রে কাজ করে। কাজ করে দর্শনের ক্ষেত্রেও। রাজনীতিতে বিপ্লব হয়। বিপ্লব হয় দর্শনের ক্ষেত্রেও। রাজনীতির ক্ষেত্রে বিপ্লব মানে অর্থনীতিকে এক চরম ধাক্কা। অর্থাৎ পুঁজির অর্থনীতি বা পুঁজিবাদ ধ্বংস। দর্শনের আঙিনায় বিপ্লব হল ভাববাদ বিনাশ। সাংবাদিক মার্কস তাঁর সাংবাদিকতার জীবনে প্রধানত রাজনৈতিক বিপ্লবের বাণী প্রচার করেছেন। দেখিয়েছেন, তত্ত্বকে কীভাবে প্রয়োগে আনতে হয়। এবং এই প্রয়োগ থেকে পুনরায় নতুন এবং উন্নততর তত্ত্বে পৌঁছোতে হয়। তাঁর মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের পাতায় আক্রমণ শানিত হত। এসবের জুতসই জবাব দিতেই তিনি তুলে নিয়েছিলেন সাংবাদিকতার কলম।

১৮৪২ সাল। তিনি যোগ দিলেন রাইনিশ জাইতুং পত্রিকায়। এক বছরের মধ্যে সরকার পত্রিকাটি বন্ধ করে দিল। ১৮৪৩ সাল। মার্কস চলে এলেন প্যারিসে। আর্নোলদ রুগের সঙ্গে যৌথভাবে প্রকাশ করেছিলেন একটি পত্রিকা। রুগে ছিলেন বামপন্থী হেগেলবাদী। এই পত্রিকার মাত্র একটি সংখ্যাই

প্রকাশিত হয়েছিল। জাইতুং পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক ছিলেন মার্কস। এই পত্রিকাটির জন্য আশিটি প্রবন্ধ লেখেন তিনি।

১৮৫৩ সাল। মার্কস লিখতে শুরু করলেন, 'নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন' পত্রিকায়। এই পত্রিকায় তিনি তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। এগুলো হল— 'ভারতে ব্রিটিশ শাসন', 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি-এর ইতিহাস ও ফলাফল' এবং 'ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল'। ১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে শুরু করে ওই ট্রিবিউন পত্রিকায় তিনি ষোলো মাস ধরে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখেন। প্রথম প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ'। এই প্রবন্ধগুলো লেখার এই দীর্ঘ সময় ধরে তিনি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের গতি-প্রগতির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন। আর যখনই দরকার হয়েছে এ বিষয়ে এঙ্গেলস-এর সহায়তা নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখতে হয় যে, তাঁর সময়ের ঐতিহাসিকরাও ভারতের 'সিপাহী বিদ্রোহ' নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন। এসব লেখায় ভারতের এই ঘটনার ভ্রান্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোকে ব্রিটিশ ভারতের এই সংগ্রামের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেছেন।

তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগের লক্ষ্যে তিনি সাংবাদিকতাকে একটা মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন। পাশাপাশি বিরামহীনভাবে লিখেছেন অসংখ্য বইপত্র। তাঁর বিশাল রচনাসম্ভার বিস্ময় জাগিয়ে তোলে আমাদের। লেখক ও সাংবাদিক হিসেবে তিনি আবিষ্কার করেছেন অসংখ্য তত্ত্ব। প্রয়োগের পথে এসব পরীক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছেন তিনি। তাঁর তত্ত্বের সত্যতা যাচাই করে নিয়েছেন মানুষের জীবনের নিরিখে। পাঠকক্ষ আর গবেষণাগারের জীবন থেকে বেরিয়ে তিনি প্রয়োগের পথে পা রেখেছিলেন বার বার। এইভাবে গড়ে উঠেছে তাঁর সমাজবিজ্ঞান— মার্কসবাদ।

এই সমাজবিজ্ঞানী মার্কস প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিয়েও ভেবেছেন, কথা বলেছেন। তিনি বলতেন, 'বিজ্ঞান যেন কখনোই একটা আত্মসুখের ব্যাপার না হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর মতে, 'বিজ্ঞান গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করতে আগ্রহী বিজ্ঞানীকে তাঁর জ্ঞান মানবজাতির সেবায় নিয়োগ করতে হবে।' লেখক ও সাংবাদিক মার্কস এইভাবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাঁর বৌদ্ধিক অবদান রেখেছেন।

ভারতবর্ষে সত্যিকারের 'ন্যাশনালিজম'-এর চেতনা কখনো ছিল না। যদিও শৈশবকাল থেকে আমাদের শেখানো হয়েছে যে, 'নেশন'-এর প্রতিমূর্তি ঈশ্বর বা মানবতার প্রতি শ্রদ্ধার চাইতেও মহৎ, কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি সে-শিক্ষা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি এবং এটা আমার প্রবল বিশ্বাস, আমার স্বদেশবাসী সংগ্রাম করে মানবতার আদর্শ থেকে স্বদেশের মূর্তি বড়ো এই ধারণা ত্যাগ করে লাভবান হবে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক মহাজীবন ও একটি ‘অন্য’ সকাল

অমূল্যকুমার ভট্টাচার্য

আমার ছেলেবেলা কাটে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলির একটি গ্রামে। এক যুগসন্ধির সময়ে। কলেজ-জীবন শুরু হয় কলকাতায়, ১৯৪৮ সালে। দেশ তখন সবে স্বাধীন হয়েছে। সর্বত্র যেন এক নবজাগরণের ফল্গুধারা। সর্বক্ষেত্রে যেন এক অসাধারণ সৃষ্টির উন্মাদনা। চতুর্দিকে যখন একটা সৃজনীশীল পরিমণ্ডল বিদ্যমান, ঠিক এমনই একটি সময়ে হঠাৎ শুরু হল আমার কর্মজীবন। ১৯৫৫ সালে। কলকাতায় উচ্চশিক্ষাপর্ব সাঙ্গ করে বাংলার বাইরে পা বাড়াতে হল। কর্মস্থল— জবলপুর, ইংরেজ জমানায় যার নাম ছিল ‘জব্বলপুর’, মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের দ্বিতীয় শহর।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দু-আড়াই হাজার ফুট উচ্চতায় সাতপুরা-বিন্ধ্য পর্বতমালার ক্রোড়ে শায়িত এক মালভূমির উপর অবস্থিত এই ছোট্ট শহরটি। পারিপার্শ্বিক নৈসর্গিক সৌন্দর্য অসাধারণ। এইরকম একটি স্থানে অবশেষে শুরু হল আমার প্রথম কর্মজীবন, কর্মস্থল— একটি কারখানা এবং বাসস্থান, চারপাশে পরিবেষ্টিত কলোনির এক কোয়ার্টারে। এইভাবে শুরু হল আমার প্রবাসজীবনও, যা এখনও চলমান।

কালক্রমে পরিচিতির পরিধির বিস্তৃতি বাড়তে লাগল। আমার সহকর্মী এবং বন্ধুদের মধ্যে এক অতিপ্রিয় মানুষ ছিল এক দক্ষিণা তামিল যুবক, নাম— এন সুব্রহ্মণ্যম, ওরফে ‘সুব্বু’। সদা হাস্য-পরিহাসময় সুব্বু-র দুটি ‘ব্যাধি’ ছিল— প্রথমটি হল, মাঝে মাঝে মৃদু কম্পিত স্বরে কোনো দক্ষিণী সুরের গৎ গেয়ে ওঠা। তার দ্বিতীয় ব্যাধিটি হল— একটি যন্ত্রদানবের প্রতি তার সন্তানবৎ প্রীতি। সেটি হল তার সাড়ে তিন হর্স-পাওয়ারের মোটরসাইকেল। আর দ্বিতীয় ব্যাধিটি ছিল যখন-তখন হঠাৎ হঠাৎ বিনা তেমন নোটিশে ও পরিকল্পনায় সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে উধাও হয়ে যেতে চাইত অচিনের উদ্দেশ্যে, গলায় যেন থাকত— ‘চ-লো যা-ই...’ সুর।

এইভাবে ছন্দহীন একটা অবিবাহিত জীবনে যখন প্রায় অভ্যস্ত হয়ে আসছি ক্রমশ, ঠিক এমনই সময় বিভ্রাট বাঁধালেন এক বাঙালিনি আমার জীবনের সঙ্গিনীরূপে এসে। এই ভদ্রমহিলাটি ছিলেন এক গজল, ঠুমরি, কাজরী, কত্থকের কিংবদন্তি শহর লক্ষ্ণৌ-এর নন্দিনী। উত্তরভারতীয় শাস্ত্রীয় কণ্ঠসংগীতের এক স্নাতক। অতএব তাঁর সাহচর্যে সেই অজানা সংগীতজগতের সঙ্গে কিছু প্রাথমিক পরিচয় ঘটল একসময়। কালক্রমে তৎকালীন সংগীতজগতের এক ব্যতিক্রমী জ্যোতিষ্ক সংগীতগুরু ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের নামের সঙ্গেও পরিচিত হয়ে গেলাম। এও একসময়ে জানা হয়ে গেল যে— ওস্তাদজি একজন বাঙালি এবং তিনি নিকটবর্তী মাইহার শহরের বাসিন্দা। কোনো এক সময়ে মাইহার এস্টের মহারাজের সংগীতগুরু হয়ে এসেছিলেন উত্তরপ্রদেশের রামপুর শহর থেকে এবং তবে থেকে মাইহারের অধিবাসী। সেই থেকে তাঁর দর্শনাভিলাষী ছিলাম আমরা।

১৯৬৭ সাল, দীপাবলির উৎসব আসন্ন। এমনই এক সন্ধ্যায় হঠাৎ ধূমকেতুর মতো আমার সেই মোটরসাইকেলধারী দক্ষিণী বন্ধু সুব্বু আমার কোয়ার্টারে এসে হাজির। কী ব্যাপার? তার কথায় শোনা যাক— ‘ভাট্টা, আজ শুক্রবার, তার মানে পরশু রবিবার এবং ছুটি। সোমবার দেওয়ালি অর্থাৎ সোম ও মঙ্গল— দু-দিনই ছুটি। এই একটানা ছুটির তিন দিন এখানে থাকলে একেবারে জং ধরে যাবে। অতএব কিছু একটা করা দরকার নয় কি?’ ‘রেওয়া গেলে হয় না?’ আমি বললাম। ‘ও. কে., তৈরি থেকো। রবিবার ঠিক সকাল সাতটায় আমরা কিক্ অফ্ করব, রাইট।’ ভীষণ খুশিতে স্প্রিঙের মতো লাফিয়ে উঠে সে আর এক মিনিটের জন্য দাঁড়াল না। তার মোটরসাইকেল মিলিয়ে গেল বাঁকের মুখে। প্রস্তাবটা আমি একটু ভেবেই করেছিলাম। রেওয়া হচ্ছে জবলপুরের উত্তর-পূর্ব দিকে এলাহাবাদগামী রাজপথের উপর একটি ছোট্ট শহর। দূরত্ব দু-শো কুড়ি কিমি। একদা ব্রিটিশ রাজত্বের করদ-মিত্র রাজ্য ‘রেওয়া’ এস্টেটের রাজধানী। মাঝখানে মাইহার। মাইহার থেকে রেওয়ার দূরত্ব ষাট কিমি। মনে মনে ছকে নিলাম— প্রথমে সোজা জবলপুর থেকে মাইহার হয়ে রেওয়া। সেখানে একদিন ও দু-রাত্রি থাকা এবং ভ্রমণ। তৃতীয় দিন সকালে

সেখান থেকে প্রস্থান। পথে মাইহার দর্শন এবং তারপর জবলপুর প্রত্যাবর্তন।

রবিবার ঠিক সকাল সাতটায় সুব্বু এসে হাজির। আমি তৈরিই ছিলাম। অচিরেই আমরা পৌঁছে গেলাম জবলপুর-এলাহাবাদ হাইওয়েতে। তার হাতের জাদুতে সুব্বুর মোটরসাইকেল ছুটতে লাগল পক্ষীরাজের গতিতে। বিকেলে পৌঁছে গেলাম রেওয়া। রেওয়া ভ্রমণান্তে মঙ্গলবার সকাল ঠিক আটটায় আবার আমরা পথে নামলাম। মাইহার হল আমাদের প্রথম গন্তব্য। তারপর প্রত্যাবর্তন জবলপুর। সওয়া ন-টা নাগাদ আমরা পৌঁছে গেলাম মাইহার। ছোট্ট শহর, আমাদের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিটি এতই বিখ্যাত যে তাঁর বাসভবন 'মদিনা ভবন' বিনা আয়াসেই খুঁজে পেলাম এবং সেখানে পৌঁছে গেলাম।

আজ থেকে ঠিক একান্ন বছর আগেকার ঘটনা, বাড়িটার রং তাই ঠিক মনে আসছে না। যতদূর মনে পড়ছে, পিঙ্ক রঙের একটা শেড। বাড়িটার সামনে একটা বাগান এবং সেখানে কাজ করছিল একজন যুবক। আমরা জানালাম আমাদের পরিচয় এবং আসার উদ্দেশ্য। শুনে সেই ব্যক্তিটি যা জানাল তা খুবই হতাশাজনক। ওস্তাদজি কাছেই বাজারে গেছেন এবং খুব সম্ভবত কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে যাবেন। তবে তিনি খুব মেজাজি এবং রাগী, কাউকে ছাড়েন না। তা ছাড়া আজকাল তিনি বেশি দেখাসাক্ষাৎ পছন্দও করেন না।

তাঁর সম্বন্ধে নানা বইপত্রে ও লেখায় তাঁর এই বিশেষ গুণের উল্লেখ পাওয়া গেছে। এমন শিষ্য তাঁর নেই যিনি এর থেকে রেহাই পেয়েছেন। মাইহার মহারাজও নাকি রেওয়াজ করবার সময় কিছু ভুল করে ফেলেন এবং ফলে তাঁর আঙুলে নাকি ওস্তাদজির ছড়ির মার লাগে। অতএব তাঁর এই গুণটি আমার কাছে অবিদিত ছিল না।

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে একবার অতীতে ফিরে গেলাম। কী কর্মকাণ্ডটাই না একদিন ঘটেছিল এখানে! আনাগোনা ছিল কত খ্যাতিমান সংগীত-ব্যক্তিত্ব ও গুণীজনদের। কঠিন অভ্যাস ও অনুশীলনের সুদীর্ঘ সময়ের, তিরস্কার ও দণ্ড সহ্য করে তবেই-না তাঁর কত শিষ্য ও শিষ্যা কালক্রমে ভুবনজয়ী শংসা ও খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। যেমন— (পুত্র) আলি আকবর, (কন্যা) অন্নপূর্ণা, (জামাতা) রবিশংকর, শরণরুলি, যতীন ভট্টাচার্য, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌত্র আশীষ ও ধ্যানেশ ইত্যাদি। এইসব সাত-পাঁচ ভাবনা-চিন্তার একটা 'ফ্যান্টাসি'-র ঘোরের মধ্যে যেন ভাসছিলাম। এমন সময় সংবিৎ ফিরে এল একটি আওয়াজে। গেটের সামনে এসে দাঁড়াল একটি সাইকেল-রিকশা। এক অতিবৃদ্ধকে তার থেকে নামতে দেখা গেল। এক হাতে একটি বাজারের থলি। নানা বইপত্র থেকে পাওয়া ছবি থেকে তাঁর চেহারা সম্বন্ধে একটা ধারণা মনের মধ্যে ছিল আগে থেকেই।

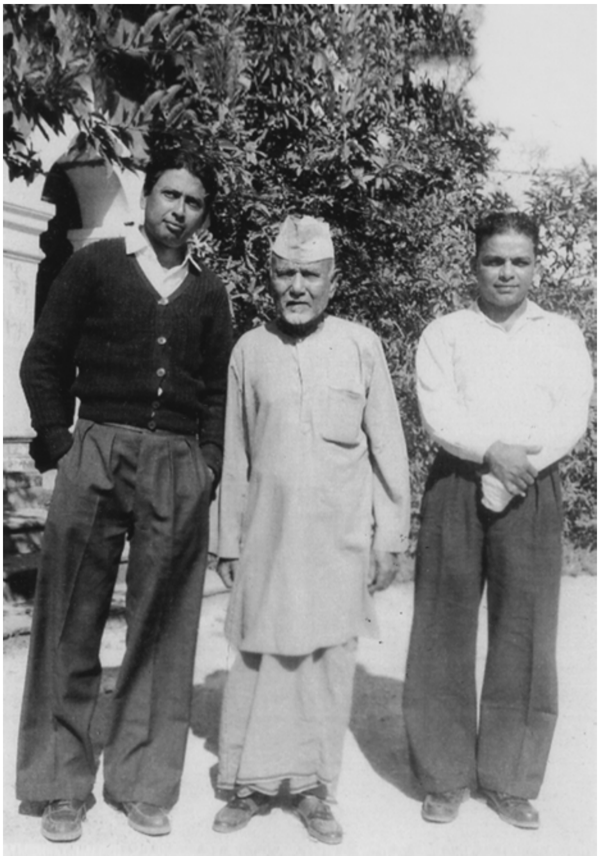

তাই বুঝতে অসুবিধা হল না এতটুকু যে ইনিই তিনি। ঈশ্বরের নাম নিয়ে দুরু-দুরু বক্ষে আমরা উভয় মূর্তিমানই সোজা পপাত তাঁর শ্রী-পদযুগলে। মনে হল— ঔষধটি কাজ করিয়াছে।

কোন ভোজবাজি যে সেদিন কাজ করেছিল, তা আজও মগজে ঢোকেনি! আমাদের জন্মকুণ্ডলীতে নবগ্রহাদির সব কুচক্রীপনা সেদিন কেমন করে যে ভেস্তে গেল। সে রহস্য আজও বোধগম্য হয়নি! অতিবৃদ্ধ তখন যেন এক প্রশান্তির মহাসাগর, আমাদের টেনে নিলেন বুকে! একেবারে কুমিল্লাই কথ্য ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন আমাদের পরিচয় ও কুশল-মঙ্গলাদি এবং আমাদের আসার উদ্দেশ্য। তারপর আমাদের নিয়ে চললেন বাগান পেরিয়ে নিজের বৈঠকখানার দিকে। সুব্বুকে আগে থেকেই বলা ছিল যে তিনি যা কিছু বলবেন তা আমি তরজমার মাধ্যমে ইংরেজিতে বুঝিয়ে দেব মাঝে মাঝে।

বৈঠকখানায় পৌঁছে আমাদের বসিয়ে তিনি গেলেন অন্দরমহলের দিকে। বৈঠকখানার ঘরটি মাঝারি সাইজের। আসবাবপত্র মধ্যম-মানের। দেওয়ালে চারদিকে অনেক তৈলচিত্র, বেশিরভাগই বিখ্যাত সব অতীত সংগীতগুরুজনদের। এক কোণে একটা উঁচু জায়গায় কিছু পায়রা বক্-বকম ভাষায় নিজেদের মধ্যে গল্পসল্প করছে। ঘরে কোনো বিজলি পাখা

চোখে পড়ল না। মাঝে মাঝে দু-একটা পায়রা পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে বাইরে যাচ্ছে। অথবা সেখান থেকে ভিতরে আসছে। এইসব যখন দেখছি, ওস্তাদজি তার মধ্যে কখন যেন ফিরে এসেছেন অলক্ষে। 'একটু চায়ের কথা বলে এলুম রে', অতিবৃদ্ধ বললেন, 'সেই কোন সকালে যে পথে বেরিয়ে পড়েছিস তোরা।'

মুখমণ্ডলে স্মিত হাসি, ওস্তাদজি প্রশ্ন করলেন, 'কী দেখছিলিস অমন করে? ঘরের কোণে পায়রা, তাদের বক্‌বকানি, ইলেকট্রিক পাখা নেই! কী ব্যাপার এসব! আসলে ওদের এই দিনভর গল্পগাছা আমাদের এই নিঃসঙ্গ জীবনকে যেন অনেক সঙ্গ-সুখ দেয়। এদের এই আসা-যাওয়ার পাখা ঝাপটানির হাওয়া আমাকে দেয় অনেক প্রশান্তি। তাই মহারাজের অনেক অনুরোধ আমাকে ফিরিয়ে দিতে হয়েছে। অবশ্য সন্ধ্যার সময়ে এদের আর এই বন্ধনে রাখি না, বাইরে পাঠিয়ে মুক্ত করে দি।' কিছুক্ষণের জন্য যেন হতবাক হয়ে গেলাম এইসব শুনে! মাইহার মহারাজ স্বয়ং যাঁর ছত্রছায়া, কয়েকটা পাখা লাগিয়ে নেওয়া তো কোনো সমস্যাই নয়!

এমন সময় একজন পরিচারক চায়ের ট্রে নিয়ে এসে সামনের টেবিলের ওপর রাখল। চায়ের কাপের দিকে নজর পড়তে ওস্তাদজি একটু যেন খেপে গেলেন। আমরা ত্রস্ত, বুঝি একটা বিস্ফোরণ ঘটবে এবার! তিনি ফিক্ করে একটু হেসে বললেন, 'গয়লা ব্যাটা বোধহয় আসেনি রে। যাক ভালোই হল। চায়ের আসল রং আর স্বাদটা বোধহয় বুঝতে পারবি। এ বাজারের চা নয়, স্পেশাল। আমার এক শাকরেদ বড়ো চা-বাগানের মালিক। সে-ই পাঠায় মাঝে মাঝে। আমাদের সারা বছরের জোগান সে-ই দেয়। কীরকম বুঝছিস বল?' দেখলাম, তাঁর কথা মিথ্যা নয়। মাথা নাড়িয়ে সেটা বুঝিয়ে দিলাম। তিনিও খুশি হলেন।

কথায় কথায় একসময় আমরা তাঁকে অনুরোধ জানালাম যে তাঁর জীবন-কাহিনি সম্বন্ধে কিছু শোনালে আমরা খুবই খুশি হব। কয়েক মিনিট কিছু ভাবলেন ওস্তাদজি। বোধহয় তাঁর বক্তব্যটি মনে মনে সাজিয়ে নিলেন। তারপর শুরু করলেন তাঁর আখ্যান। বলে চললেন একটার পর একটা অধ্যায়— শৈশব, কৈশোর, যৌবন, মধ্যবয়স ইত্যাদি। অবশেষে একসময়ে এসে পৌঁছোলেন বর্তমানে। তাঁর শিক্ষাজীবন বিস্ময়করভাবে সংগ্রামী। নানা বইপত্রে তাঁর সম্বন্ধে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, আর আমাদের কাছে সেদিন তিনি যা যা ব্যক্ত করেছিলেন— উভয়ই প্রায় অভিন্ন। সুতরাং পরিসরের স্বল্পতা বিবেচনা করে এখানে তার পুনরুল্লেখ সমীচীন মনে হল না। তবে দু-একটি ব্যতিক্রমী এমন কথা এখানে দেওয়া হল, যা অন্যত্র চোখে পড়েনি:

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব তাঁর সাংগীতিক প্রতিভার সর্বভারতীয় পরিচিতি প্রথম পান সম্ভবত ১৯১৯ সালের গোড়ার দিকে অনুষ্ঠিত কলকাতার বিখ্যাত ভবানীপুর সংগীত সম্মেলনে তাঁর বিরল প্রদর্শনের পর। তাঁর কথাতেই শোনা যাক সেই অভিজ্ঞতার কথা— 'জানিস, আমি তখন যুক্তপ্রদেশের রামপুর শহরের বাসিন্দা। সেখানকার নবাব সাহেবের প্রধান সভাগায়ক বিখ্যাত উজীর খাঁ সাহেবের কাছে তালিম নিচ্ছি। ওই তোদের কলকাতার ভবানীপুর না কী যেন একটা জায়গা, সেখানে নাকি মাইফেল হবে। সেখান থেকে দাওয়াত (নিমন্ত্রণ) গেল আমার ওস্তাদের কাছে। কী কারণে যেন আমার ওস্তাদজির পক্ষে কলকাতা যাওয়া সম্ভব হল না। তাঁর জায়গায় আমাকে পাঠাবার প্রস্তাব করলেন তার-যোগে। প্রস্তাব স্বীকৃত হল। একটা পুঁটুলি আর যন্তরখানা (সরোদ) নিয়ে পাড়ি দিলাম কলকাতায়, যেখানে অতীতে একদিন পৌঁছেছিলাম শিক্ষা এবং একজন সংগীত শিক্ষাগুরুর সন্ধানে। ভবানীপুর সংগীত সম্মেলনের তখন খুব নামডাক। গিয়ে নামটি লিখিয়ে এলাম। কেউ পাত্তাই দেয় না। ওস্তাদ আবার বাঙালি হয় নাকি? বাঙালি ওস্তাদ আবার কী বাজাবে! এইসব শুনতে শুনতে কান যেন ঝালাপালা হয়ে গেল। যাইহোক নির্দিষ্ট রাত্রে ন-টার সময় হাজিরা দিলাম।'— বৃদ্ধ থামলেন একটু, বোধহয় বক্তব্যকে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য।

'তারপর আবার শুরু হল, রথী-মহারথীরা এক এক করে তাঁদের কাজ সারলেন। ক্রমে রাত প্রায় তিনটে বাজল। একসময়ে আমার নাম ঘোষণা হল। আসর তখন অর্ধেক ফাঁকা। ' বৃদ্ধ আবার বলতে শুরু করেছেন, 'শ্রোতাদের কেউ কেউ খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হুঁকো সেবা করছেন। আসরে পৌঁছে ভূমি স্পর্শ করে প্রণাম করলাম। চারিদিকে একবার দেখে নিয়ে বাদ্যযন্ত্রটি উঠিয়ে নিয়ে মাথায় ঠেকালাম। যন্ত্রে সুর সংযোগ করার আগে মা সরস্বতী ও আমার ওস্তাদজিকে স্মরণ করে একসময় শুরু করলাম। আজ ঠিক মনে পড়ছে না, বোধহয় পুরিয়া রাগ দিয়ে। তারপর আর কিছু মনে পড়ে না। ক্রমে আমি নাকি একটা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিলাম। চোখদুটি যখন খুললাম, দেখলাম সামনে যাঁরা হুঁকো সেবায় ব্যস্ত ছিলেন তাঁদের হুঁকো মুখে যেন আটকে গেছে। শুনলাম, চার ঘণ্টা বাজিয়ে ছিলাম। চারিদিকে হইচই, এমন বাজনা নাকি বহুদিন শোনা যায়নি। বাইরে তখন রোদ ওঠার পালা।' বৃদ্ধ একটু থামলেন।

'পরের দিনের খবরের কাগজে এইসব খবর বেরুল। কলকাতার "স্টেটস্‌ম্যান" কাগজ কীভাবে যেন মাইহার মহারাজের কাছে পৌঁছুল।' বৃদ্ধ শুরু করলেন আবার, 'মহারাজের কাছ থেকে খবর এল, তাঁর সভাবাদক হতে হবে। আমি জানালাম— ভেবে দেখতে হবে। কিন্তু তার আগে

একবার গুরুর কাছে যাওয়া দরকার, সাফল্যের খবরটা তাঁকে নিজের মুখে জানানো দরকার। মহারাজের আমন্ত্রণে এখানে (মাইহারে) এলাম। মহারাজের হেফাজতে দারুণ আছি তাঁর অতিথিশালায়। একদিন মহারাজের কাছ থেকে ডাক এল। পরিচারক যেখানে নিয়ে গেল, সেটা একটা হলঘর। দেওয়ালে দেওয়ালে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র টাঙানো। সুসজ্জিত ঘরটির এক প্রান্তে মহারাজ আসীন। যেতেই উঠে আমাকে বসতে বললেন। কিছু একথা সেকথার পর যন্ত্রগুলি দেখিয়ে আমার কাছ থেকে জানতে চাইলেন যে সেগুলো বাজাতে পারি কিনা। আমি দেওয়াল থেকে এক একটা যন্ত্র নামাই, আর বাজিয়ে দেখিয়ে দি। এইভাবে সানাই, এসরাজ, বাঁশি, ক্ল্যারিওনেট, সরোদ, ভায়োলিন, মৃদঙ্গ, তবলা ইত্যাদি— এক এক করে বাজিয়ে দেখিয়ে দিলাম। যখন এইসব চলছে, মনে মনে মহারাজের মুণ্ডপাত করছিলাম— ছোকরা, যন্ত্র হচ্ছেন সাক্ষাৎ মা সরস্বতী, নচেৎ এঁদের অনেককেই পা দিয়ে বাজাবার ক্ষমতা রাখি। প্রচণ্ড রাগের জন্য এই অনুচিত চিন্তা মাথায় এসেছিল। এখনও অনুশোচনা হয় খুবই। মহারাজের মুখে হাসি। জানালেন যে আমাকে সংগীতগুরু ও সভাবাদক হিসেবে পেলে তিনি কৃতার্থ হবেন। জানালাম— তথাস্তু, কিন্তু আমার ওস্তাদজির অনুমতি পেলে তবেই। তিনি রাজি হয়েছিলেন। তাই করেছিলাম। ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে এখানে আসি এবং তবে থেকে তাঁরই ছত্রছায়ায় এখানে আছি।' ওস্তাদজি থামলেন।

আবার এক প্রস্থ চা এসে গেছে। এবার অবশ্য দুধ-চা, বর্ণে, গন্ধে ও স্বাদে অপূর্ব। কীভাবে যেন রাগ বৃন্দাবনী সারং-এর প্রসঙ্গ এসে পড়ল। ওস্তাদজি হঠাৎ একটু যেন উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু মৃদু হেসে মন্তব্য করলেন, 'আরে, ও যে "মেঘ"-রাগের ব্যাটা রে!' কেন এমন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তাঁর, তিনিই জানতেন। আমার কাজ শুধু কথাকারের ভূমিকা সামলানো। যাঁরা সংগীতজ্ঞ, তাঁরা একবার এ সম্বন্ধে ভেবে দেখতে পারেন। আমি নিতান্তই অসহায়।

ভীষ্ম পিতামহের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। একসময়ে তাঁকে একটা প্রশ্ন করেই বসলাম— 'আপনার তো অগণিত শিষ্য-শিষ্যা এবং তাঁদের অধিকাংশই আজ খ্যাতির শীর্ষে। এখন যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় যে এদের মধ্য থেকে এমন মাত্র একজনের নাম করুন যাঁর বাদন-শৈলীতে আপনি তাঁর সৃজন প্রতিভার বিশেষ স্ফুলিঙ্গ বা দ্যুতি লক্ষ করেন বা করেছেন।' কিছুক্ষণ যেন কীসব ভাবলেন তিনি, তারপর কিছুটা যেন আত্মসমাহিতভাবে উত্তর দিলেন, একটু অন্যভাবে, 'নিখিলের বাজনা শুনেছিস কি তোরা কখনো? দেখিস, একদিন ওর হবে, নিশ্চয়ই হবে।'

তাঁর এই বক্তব্যটা হয়তো একটা বিতর্কের আবর্ত সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু আমি নিতান্তই অপারগ। যা সেদিন সজ্ঞানে এবং স্বকর্ণে শুনেছিলাম, তা হুবহু আজ লিখলাম, আজ একান্ন বছর পরে, কোনো স্মৃতিভ্রম অবশ্যই ঘটেনি।

বিগত শতাব্দীর সাতের দশকের শেষভাগে কোনো এক অনুষ্ঠানে যোগদান হেতু আমাদের এই লক্ষ্ণৌতে আসেন পণ্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন তাঁর সঙ্গে কিছু কথাবার্তার সুযোগ হয়। সেই অবসরে উক্ত ঘটনাটি তাঁকে শোনাই। তিনি স্তব্ধ হয়ে যান যেন। আত্মসমাহিতভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে গুরুর উদ্দেশ্যে হাতজোড় করে তাঁর বিনম্র প্রণাম নিবেদন করেন। অতীব দুঃখের বিষয় এই যে তাঁর অকাল প্রয়াণের (১৯৮৬) জন্য তাঁর গুরুর সেই স্বপ্ন পূরণ হতে পারেনি।

'আর কী জানতে চাস তোরা', ওস্তাদজি প্রশ্ন করলেন। ঘড়ির দিকে একবার তাকালাম, কাঁটা বেলা বারোটার ঘরে পৌঁছোতে আর দেরি নেই। অতিবৃদ্ধকে এবার রেহাই দেওয়া সমীচীন। তাই আমাদের শেষ প্রশ্ন রাখলাম তাঁর সামনে, 'রাগ ভৈরবীর স্বরূপ সম্বন্ধে আপনার ধারণা যদি একটু ব্যক্ত করেন।' বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, 'বড়ো কঠিন প্রশ্ন রে! তবে প্রশ্ন যখন একটা করেছিস, উত্তরও তো একটা দিতেই হয়।' অতিবৃদ্ধ থামলেন একটু।

এরপর তিনি যে-রকমটি বলেছিলেন, 'আমাদের শাস্ত্রীয় সংগীতে রাগ-রাগিণীর ব্যাপারটা অত সহজ নয়। আমাদের চারপাশের প্রকৃতির বিভিন্ন সময়ের নানা রূপ ও ভাব প্রকাশ করার প্রসঙ্গে বা মানুষের মনে বিভিন্ন সময় সুখ, দুঃখ, বিরহাদির প্রকাশ প্রসঙ্গে আমাদের রাগ-রাগিণীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। প্রত্যেক রাগ-রাগিণীর উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে এইসব কথা মাথায় রেখে। আমার বয়স এখন একশো ছাড়িয়ে গেছে। এই পর্যন্ত কত রাগ-রাগিণী নিয়ে আমি নাড়াচাড়া করেছি। কিন্তু আমার ধারণা কী জানিস? এদের মধ্যে শুধু কোনো একটা রাগ নিয়ে যদি হাজার বছর ধরে কঠিন অনুশীলন করবার সুযোগ পেতাম, তা হলেও বোধহয় তার তল পেতাম না! তাই, তোর এই প্রশ্নের জবাবে আমার উত্তরটা যে সঠিক কী হওয়া উচিত, তা বুঝতে পারছি না।'

'রাগ ভৈরবীর স্বরূপ চিন্তা করা খুব সহজ কাজ নয়। কখনো মনে হয় তিনি যেন এক যোগিনী, সম্পূর্ণরূপে রিক্তা, ঈশ্বর-পদে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিতা। আবার কখনো যেন মনে হয় মায়া ও মমতার মূর্তিময়ী প্রকাশ যেন তিনিই। তাঁর পর আর যেন কেউই নেই, সবই যেন নিষ্প্রভ ও অস্তিত্বহীন।' থামলেন ওস্তাদজি।

ঢং ঢং করে দুপুর বারোটা বাজল সামনের ঘড়িতে। এবার অতিবৃদ্ধকে রেহাই দিতে হয়। গত আড়াই ঘণ্টা ছিলাম যেন একটা স্বপ্নিল দুনিয়াতে! দু-জনেই আমরা আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালাম তাঁকে। যাবার অনুমতি প্রার্থনা করে তাঁকে জিজ্ঞাসা

করলাম, 'এবার আমরা তবে আসি?' তিনি ঈষৎ হেসে বললেন, 'আসবি? তবে আয়।' মাথা নাড়িয়ে তাঁকে জানিয়েছিলাম, 'আবার আসব নিশ্চয়ই।'

ঘর থেকে বেরিয়ে বাগান পেরিয়ে গেটে যাওয়ার সময় কত কী ভাবছিলাম। নিজেদের সৌভাগ্যের ওপর সত্যিই ভীষণ ঈর্ষা হচ্ছিল! কোথায় গেল তাঁর রাগারাগি, বকাঝকা? হাত নাড়িয়ে অতিবৃদ্ধ আর একবার বললেন, 'আবার আসিস কিন্তু।' মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানিয়েছিলাম। সুব্বুর ইশারায় তার যন্ত্রদানব গর্জে উঠল। শ্রী শ্রী মাতা সারদার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালাম। মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, 'আবার আসব মা তোমার কাছে।' সুব্বু এক্সিলারেটারে একটু চাপ দিতেই তার পক্ষীরাজ একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ছুটতে লাগল জবলপুরের পথে। মদিনা ভবন পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল একসময়ে।

হ্যাঁ, কথা রেখেছিলাম। আবার গিয়েছিলাম মাইহারে, পঁচিশ বছর পরে। শ্রী শ্রী মাতা সারদা মায়ের মন্দিরে সব করণীয় সমাপনান্তে পাহাড় থেকে নেমে শহরের মধ্য দিয়ে চলবার পথে একসময় সেই 'মদিনা ভবন'-এর সামনে এসে যখন দাঁড়ালাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না বিশেষ। শুনেছিলাম সেই মহামানবটি সামনের বাগানে কোথাও শায়িত আছেন। তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে কয়েক মিনিটের মৌনতা পালন করে গন্তব্যের পথে পা বাড়ালাম একসময়ে। সন্ধ্যাকাশের মিটিমিটি হাসতে থাকা একটি নাম-না-জানা তারা শুধু এইসবের নীরব সাক্ষী হয়ে রইল।

আমাদের বাংলা ভাষায় একটা কথা আছে— 'স্মৃতি সতত সুখের।' কথাটা খুবই সুন্দর। মিষ্ট এবং মূল্যবানও বটে। স্মৃতিই হল বিশেষত বার্ধক্যের 'ওয়েসিস'। এর আশ্রয়েই আমার সাতাশিটি বসন্ত পার করা সম্ভব হল। জানি না 'পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে শেষে!'

আমি কোনো এক বিশেষ 'নেশন'-এর বিরুদ্ধে নই। আমি সাধারণভাবে 'নেশন' ধারণাটিরই বিরুদ্ধে।...

'ন্যাশনালিজম' এক অতিশয় ক্ষতিকর ধারণা। এটা হল সেই বিশেষ বস্তু যা বহু বছর ধরে ভারতবর্ষের যাবতীয় দুর্বিপাকের মূলে রয়েছে। এবং যেহেতু আমরা এমন এক 'নেশন' দ্বারা শাসিত ও অবদমিত হচ্ছি যার দৃষ্টিভঙ্গি মূলত রাজনৈতিক। আমরাও সে-কারণে আমাদের রাজনৈতিক ভাগ্যনির্ধারণের জন্য সচেষ্ট হয়ে পড়েছি, যদিও আমাদের ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকার ভিন্ন।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গীতা মুখার্জি: অতি বিরল রাজনীতিক

গৌতম রায়

লোকসভাতে ভিপি সিং সরকারের উপর আস্থাভোট চলছে। আবেগমথিত বক্তৃতা দিচ্ছেন গীতা মুখোপাধ্যায়। ধরা গলাতে অনেক কথা ঠিক মতো শুনতেও পাওয়া যাচ্ছে না দর্শক আসন থেকে। কান্নায় বুজে আসছে সাংসদের গলা। লোকসভা জমজমাট। অধ্যক্ষের আসনে উড়িষ্যার সাংসদ রবি রায়।

তিনি একবার ইংরেজিতে, একবার বাংলায়, তো আর একবার হিন্দি, পরের বারই ওড়িয়ায় আবেদন করে চলেছেন—মিসেস মুখার্জি চুপ করুন। শান্ত হন। গীতা মুখার্জির গলা যেন আবেগে তত বুজে আসছে। জাতীয় রাজনীতিকে প্রেক্ষিতে রেখে তাঁর নির্বাচনী এলাকা পাঁশকুড়ার একটি সমস্যাকে তিনি তুলে ধরছিলেন সংসদে।

বক্তৃতা দিয়ে বসলেন গীতা মুখার্জি। দর্শকাসন থেকে দেখা গেল তৎক্ষণাৎ প্রায় ত্রস্ত গতিতে তাঁর দিকে ছুটে গেলেন বিরোধী বেঞ্চ থেকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। গীতাদির পাশে বসে মৃদুস্বরে তাঁকে কিছু বলছেন, এটা দূরের দর্শক আসন থেকে বোঝা গেল। সংসদের অধিবেশনে তো যা ভবিতব্য, তাইই হল। পরাজিত হল ভিপি সিং সরকার। ফেরার পথে গীতাদিকে জিজ্ঞাসা করলাম—হঠাৎ রাজীব গান্ধী পাশে এসে বসে কী বললেন?

একগাল হেসে গীতাদির উত্তর— কী বললেন জানিস, এত না চ্যাঁচালেই কি চলছিল না? ভুলে গেছ, ক-দিন আগে হার্টের বড়ো সমস্যা ধরা পড়েছে? এই বক্তৃতাকে গীতাদি অভিহিত করেছিলেন 'শেষ বক্তৃতা' হিসেবে।

বস্তুত পরের নির্বাচনে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবারই ইচ্ছা ছিল না তাঁর। ননদগোপাল ভট্টাচার্য কার্যত গীতাদির জীবনের শেষ নির্বাচনে খানিকটা তাঁর সঙ্গে 'আপনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেবো' গোছের হুমকি দিয়ে জীবনের শেষ নির্বাচনে দাঁড়াতে তাঁকে বাধ্য করেছিল। কারণ, '৯১ সালে বাইপাস অপারেশনের পর গীতাদির শরীর একদমই ভালো যাচ্ছিল না। তার উপরে নিজের পাঁশকুড়া এবং দলীয় সাংসদ ইন্দ্রজিৎ গুপ্তর খড়্গপুর, এই দুটি লোকসভা কেন্দ্রই কার্যত গীতা মুখার্জিকে দেখতে হত। সাংসদ হিসেবে খ্যাতির শীর্ষে থাকা ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত নিজের নির্বাচনী কেন্দ্র খড়্গপুরের জন্যে বিন্দুমাত্র সময় দিতেন না। এই শারীরিক ধকলেই ওভাবেই হঠাৎ আবার গীতা মুখার্জির ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক এবং সব শেষ।

সাংসদ জীবনের বক্তৃতার ভিতরে এই 'শেষ বক্তৃতা'কে বিশেষ রকমের গুরুত্ব দিতেন গীতা মুখার্জি, যেমনটা গুরুত্ব দিতেন বিধায়ক হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভাতে দেওয়া ফারাক্কা বাঁধের ওপর দেওয়া একটি বক্তৃতাকে। 'শেষ বক্তৃতা'র বিষয়টি গীতা মুখার্জীর নির্বাচনী কেন্দ্র পাঁশকুড়ার এক মহিলার হার্ট অপারেশনের জন্য বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সাহায্য নিয়ে গড়িমসি সংক্রান্ত হলেও বক্তৃতাটির অন্তর্নিহিত বক্তব্য ছিল কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক।

কেন্দ্রে বন্ধু সরকার ক্ষমতাসীন থাকা সত্ত্বেও সমস্ত রকম সরকারি নিয়ম মেনে আবেদন করার পরও একজন হার্টের রোগীর চিকিৎসার জন্যে বরাদ্দ টাকা পাঠাতে কেন্দ্রের টালবাহানার ভিতর দিয়ে গীতা মুখার্জি সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার, তার রাজনৈতিক বিন্যাস শক্তপোক্ত বা নড়বড়ে যাই হোক না কেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো রক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সদিচ্ছার অভাবটা কোথায় লুকিয়ে রয়েছে। গীতা মুখার্জীর সেদিনের সেই ভাষণের প্রাসঙ্গিকতা আজও তাই হারিয়ে যায়নি।

আজও বহু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেই, বিশেষ করে তিনি যদি কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দলের লোক না হন, তাঁকে এই ফেডারেল স্ট্রাকচার নিয়ে সরব হতে দেখা যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে মানিক সরকার— সকলের ক্ষেত্রেই এই ঘটনা ঘটে চলেছে। গীতা মুখার্জি সেদিন এই যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর পরিপূর্ণ মর্যাদা দেওয়ার কথাই লোকসভাতে আবেগমথিত কণ্ঠে বলেছিলেন।

কেবল রাজীব গান্ধী নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সেই সময়ের বিজেপি সাংসদ দীপিকা চিকলিয়ার সঙ্গে এমনটাই ছিল

গীতা মুখার্জির সম্পর্ক। সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে গীতাদি যেভাবে সকলের হয়ে উঠতে পেরেছিলেন তা বামপন্থী শিবির তো বটেই, অবাম শিবিরেরও কেউই এমনভাবে সর্বজনমান্য এবং সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠতে পারেননি। সংসদের সেন্ট্রাল হলে এই দৃশ্য প্রায়ই দেখা গেছে যে, গীতা মুখার্জির অত্যন্ত সাধারণভাবে পড়া, কিছুটা ধোপদুরস্ততাহীন শাড়িটা নিজের হাতে পরিপাটি করে দিচ্ছেন বিজেপি সাংসদ দীপিকা চিকলিয়া।

গীতাদি বলতেন— একমাত্র রাজমাতা বিজয়রাজে সিন্ধিয়া ছাড়া প্রত্যেকের সঙ্গে দলমতের উর্ধ্বে উঠে আমার একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে। বিজয়রাজের দাম্ভিকতা আর আদবানির 'শ্রুডনেস'-কে মন থেকে অপছন্দ করতেন গীতা মুখার্জি।

বাইপাস সার্জারি হবে গীতা মুখার্জির। রাজনৈতিকভাবে ও আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় টানা টানা-পোড়েন। উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরুর মুখে। গীতা মুখার্জি প্রথমে ভর্তি হলেন অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সে। অগ্রজাপ্রতিম গীতাদির বাইপাস হবে শুনে ছুটে এলেন রাজীব গান্ধী। প্রায় পয়তাল্লিশ মিনিট রইলেন গীতাদির ঘরে।

উপসাগরীয় যুদ্ধ থেকে বিশ্বনাথ মুখার্জির স্বাস্থ্য সব নিয়ে প্রাণখোলা আলোচনা হল। কী অপূর্ব ছিল সেদিন দেশের জাতীয় রাজনীতির সৌজন্যের আবহাওয়া। বিদায় নেওয়ার আগে রাজীব ব্যক্তিগতভাবে গীতা মুখার্জির চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয়ভার পর্যন্ত বহন করতে চেয়েছিলেন। এমনটাই ছিল ব্যক্তি রাজীব গান্ধীর ব্যক্তি গীতা মুখার্জির প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা।

তবে এআইআইএমসে শেষপর্যন্ত গীতা মুখার্জির বাইপাস অপারেশন হল না। সেখানে উনি চিকিৎসক কলের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। অজানা কারণে কল একটু খারাপ ব্যবহার করলেন গীতাদির সঙ্গে। পত্রপাঠ সেই হাসপাতাল ছেড়ে বেরিয়ে চলে এলেন গীতাদি। ভর্তি হলেন এসকর্টসে ডা: নরেশ ত্রেহানের তত্ত্বাবধানে। অপারেশনের পরও রাজীব গান্ধী এসেছেন তাঁর গীতাদিকে দেখতে। সেবারও গীতাদির কেবিনে একান্তে তাঁর প্রিয় গীতাদির সঙ্গে প্রায় ঘন্টা দেড়েক। সেই বছরই অক্টোবরে মারা গেলেন বিশ্বনাথবাবু। ভারতের ছাত্র আন্দোলনের ওই কিংবদন্তি মজা করে বলতেন— জানিস, তোর গীতাপিসির দাঁত দেখে আমি প্রথম ওঁর প্রেমে পড়েছিলাম!

ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর কলকাতার রাস্তায় দাঙ্গা রুখতে গীতা মুখার্জির এক অনন্য সাধারণ মানবী রূপ আমরা দেখেছিলাম। সামগ্রিকভাবেই বামপন্থীরা সেদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন দাঙ্গা রুখতে। তবুও গীতাদি যেন ছিলেন একটু বেশি রকমের অন্য রকমের। কোনো প্রচারমাধ্যমের আলোর সামনে নয়, যেভাবে '৯২ এর ৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যা থেকেই তিনি মধ্য কলকাতার ট্যাংরা অঞ্চলে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তাঁর সেই সাহস, মমতা, ধৈর্য, স্নেহ— কোনো শব্দ দিয়ে তাকে প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়।

ওই সময়কালে ট্যাংরার বেঙ্গল পটারিজ তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে। গীতাদির দল সিপিআই যেহেতু ওই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তাই সেই সময়কালটাতে ওঁর ট্যাংরা অঞ্চলে একটু বেশিই যাতায়াত ছিল। ঐতিহাসিক বাবরি ধ্বংস হচ্ছে এই খবর পাওয়া মাত্রই অন্য বামপন্থী রাজনৈতিক নেতারা যেভাবে যা উদ্যোগ নিতে শুরু করুন না কেন অকুতোভয় গীতা মুখার্জি কিন্তু তাঁর গুটিকয় একান্ত অনুগামী, তাঁরা হয়তো সবাই তাঁর রাজনৈতিক দলেরও নয়, তাঁদেরকে নিয়ে পথে নেমে পড়েন।

আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন ছেচল্লিশের দাঙ্গার কথা। কোনোরকম নিরাপত্তার পরোয়া না করে ছুটে যান রাজাবাজার অঞ্চলে সংখ্যালঘু মানুষদের ভিতরে। সেখানে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে একত্র করে যেকোনো মূল্যে দাঙ্গা রোখার সংকল্প নেন। শীতের রাত। এখনও মনে আছে তাঁর গায়ে একটা ঘিয়ে রঙের কার্ডিগান। তার উপর জড়ানো ছাই রঙের একটা শাল। আমি একটু সকালের দিকে গিয়েছিলাম বলে সোয়েটার পরে যাইনি। আমাকে তিনি বাড়ি ফিরতে দিলেন না। বললেন, মাকে ফোন করে দে। আজকে আমার সঙ্গে থাকবি। নিজের শালটা গায়ের থেকে খুলে আমাকে দিয়ে বললেন, পড়ে নে। অমন অপার মাতৃস্নেহের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি জীবনে গর্ভধারিণী ব্যতীত আর কোথাও পাইনি।

দাঙ্গা রুখতে সে এক অনন্য সাধারণ ভূমিকা গীতা মুখার্জির। একেবারে ভূমিস্তরের বামকর্মীদের সঙ্গেও যেমন ঠিক তাঁদেরই মতো একজন কর্মী হয়ে সদাসতর্ক প্রহরীর ভূমিকা পালন করছেন, আবার প্রয়োজন মতো সরাসরি যোগাযোগ করছেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে, তেমন সমন্বয় রাখছেন নিজের দলের নেতৃত্ব কিংবা বামদলের অন্যান্য নেতৃত্বের সঙ্গে আবার পরক্ষণেই একটি পরিবারকেও বাঁচাবার সম্ভাবনা দেখা দিলে কোনোরকম দ্বিধা সংকোচ না করে সরাসরি যোগাযোগ করছেন বিরোধীদল কংগ্রেসের নেতৃত্বের সঙ্গেও।

পাঠক মনে রাখবেন, সেদিন কিন্তু আজকের মতো মোবাইল ছিল না আর যোগাযোগ বলতে কেবল নির্ভর করতে হত ল্যান্ড লাইনের উপরেই। মানুষের স্বার্থে নিজের দল বা বিরোধীদল— কারও সঙ্গেই যোগাযোগ নিয়ে গীতা মুখার্জির ভিতরে বিন্দুমাত্র ছুৎমার্গ ছিল না। মানুষই ছিল তাঁর কাছে এক এবং একমাত্র অগ্রাধিকার। আর রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভিতরে জ্যোতি বসু

ছাড়া গীতা মুখার্জির মতো সব দলের সব রকমের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বুঝি কী বাম, কী অবাম কোনো রাজনৈতিক দলেরই অন্য কারোর ছিল না।

গীতা মুখার্জির দল সিপিআই জরুরি অবস্থার সমর্থক ছিল। তবে অনেকেই হয়তো জানেন না যে, ওঁদের দলের জাতীয় কর্মসমিতির যে বৈঠকে জরুরি অবস্থাকে সমর্থনের প্রস্তাব নেওয়া হয়, সেই বৈঠকে ওই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন বিশ্বনাথ মুখার্জি এবং গীতা মুখার্জি। পরবর্তী সময়ে এইচডি দেবেগৌড়া সরকারে যোগ দেওয়ার প্রশ্নেও তীব্র বিরোধিতা ছিল গীতা মুখার্জির। জরুরি অবস্থার বিরোধিতা করলেও দলের প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রে গীতা মুখার্জির ভূমিকা ছিল প্রশ্নাতীত। তাই জরুরি অবস্থা নিয়ে মানসিক যন্ত্রণা সয়েও তাঁকে কাজ করতে হয়েছিল জরুরি অবস্থার অন্যতম খলনায়ক বংশীলালের সঙ্গে। এই বংশীলালের সঙ্গে জরুরি অবস্থার সময়ে কাজ করার অভিজ্ঞতাকে গীতা মুখার্জি তাঁর জীবনের সবথেকে বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা বলে বর্ণনা করতেন। তবে তিনি বিশ্বাস করতেন— বংশীলালের জরুরি অবস্থার সময়কালের বহু দুরভিসন্ধি তিনি নানা কায়দায় আটকে দিতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিল গীতা মুখার্জির ঠোঁটস্থ। কীভাবে এটা সম্ভব হল? মা মরা মেয়ে গীতাকে রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য দিতেন বাবা লালুবাবু। তাই ছোটোবেলাতেই বাবার মুখে শুনে শুনেই রবীন্দ্রনাথ প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল গীতার। কী সংসদে, কী রাজনৈতিক সভায়, কী বিদেশে, কী গুরুগম্ভীর সেমিনারে গীতা মুখার্জি বক্তৃতা করছেন, অথচ রবীন্দ্রনাথ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন না— এমনটা ভাবাই যায় না। জীবনের একদম শেষ দিকে বাইপাস সার্জারির পর বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করতে হলে আগে একবার লিখে নিতেন। মজা করে বলতেন, হার্ট অপারেশন করতে গিয়ে ব্রেনের কলকবজা বোধহয় গোলমাল করে দিয়েছে। তাই পাছে ভুল না হয়, সেইজন্যে আগে লিখে নিই।

শেষ দিকে তাঁর সংসদে দেওয়া অসংখ্য বক্তৃতার সঙ্গে এইসব রবীন্দ্র উদ্ধৃতি, তাঁর নিজের হাতে লেখা— আমার এক অমূল্য সম্পদ। অনেকেই হয়তো জানেন না শম্ভু মিত্রের নাটকের দলে গীতা মুখার্জি অভিনয় পর্যন্ত করেছিলেন। 'বাঁশরী' ছিল সেই নাটকের নাম। নাটকটি শান্তিনিকেতনে পর্যন্ত অভিনীত হয়েছিল। নাটক দেখে প্রতিমা দেবী বলেছিলেন, 'এই মেয়ের তো রাজনীতির দলে নয়, শান্তিনিকেতনে থাকা উচিত।'

'বাঁশরী' নাটকে কেমন করে পা বেঁকিয়ে হেঁটে অভিনয় শিখিয়েছিলেন শম্ভু মিত্র, গীতা মুখার্জি অনেক বেশি বয়সেও তা আমাদের অভিনয় করে দেখিয়েছিলেন। আমি তাঁর রাজনৈতিক দলের চার আনা সদস্যও নই। বামপন্থায় বিশ্বাসী এক ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে যে প্রশ্রয় তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলাম তা আমার জীবনের এক দুর্লভ সৌভাগ্য। সতীর্থদের সঙ্গে তো বটেই কট্টর বিরোধী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে গীতা মুখোপাধ্যায়ের যে অনাবিল ভালোবাসার সম্পর্ক দেখেছি— তা আজকের দিনে কেমন রূপকথা মনে হয়।

মমতাকে দেখেছি বামপন্থীদের কোনো কথাতে খুব রেগে গিয়ে ঝাঁঝালো অনুযোগ করতে তাঁর গীতাদির কাছে। আবার চিরন্তন মাতৃপ্রতিমা স্বরূপ গীতা মুখার্জিকে দেখেছি শান্ত গলায় বলতে— তুই ওসব পাতা না দিয়ে নিজের মতো থাক। গীতাদির স্নেহের অনাবিল স্রোতোধারাতে কে ছিলেন না? তাঁর ভাশুরজি কল্যাণী মুখার্জি কুমারমঙ্গলমের ছেলে রঙ্গরাজন কুমারমঙ্গলম (গীতাদির স্নেহের 'থাম্বি') থেকে বাম সাংসদ মহম্মদ সেলিম, এঁদের প্রতি তাঁর একটা অপত্য টান ছিল।

গীতা মুখার্জির জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ হল সংসদে মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন এবং মহিলাদের জন্যে ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের সুপারিশ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই যৌথ সংসদীয় কমিটির সভ্য ছিলেন। তিনি মাত্র একদিন এই কমিটির বৈঠকে যোগ দেওয়ায় গীতা মুখার্জি তাঁকে স্নেহের বকুনিও দিয়েছিলেন। আর মমতাও বোধহয় এই একমাত্র বামপন্থী ব্যক্তিত্ব গীতা মুখার্জি— যাঁকে শুধু শ্রদ্ধাই করতেন না, অন্তর দিয়ে ভালোও বাসতেন। তাই মমতা এনডিএ জমানাতে রেলমন্ত্রী থাকাকালীন শিয়ালদহ স্টেশন থেকে কাটিহার এক্সপ্রেস (এখন নাম হাটেবাজারে) উদ্‌বোধনের সময়ে গীতা মুখার্জিকে কেবল আমন্ত্রণই জানাননি, একসঙ্গে পতাকা নেড়ে গাড়িটির যাত্রা-সংকেত দিয়েছিলেন।

এখন কেবলই মনে হয় ম্যারি হপকিন্সের সেই গান— 'দাউ দ্যাট ডেইজ হ্যাজ গন।' গীতা মুখার্জির স্বপ্ন ছিল ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ সংসদে। নিষিদ্ধ পল্লির মহিলারা এই বিলের দাবিতে তাঁকে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। গীতা মুখার্জির সেই স্বপ্ন কি স্বপ্নই থেকে যাবে?

চিঠির বাক্সো

'পুনঃপাঠ' অংশটি *আরেক রকম* পত্রিকার এক চিন্তাশীল অঙ্গ। এই বিভাগে প্রতি সংখ্যাতেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়। ১-১৫ মার্চ (২০১৯) সংখ্যাতে প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের একটি অসামান্য তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধ পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে; এই 'বিদ্যাসাগর ও বেসরকারি সমাজ' প্রবন্ধটি লেখকের *টীকা টিপ্পনী* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। গোলাম মুরশিদ সম্পাদিত *বিদ্যাসাগর* গ্রন্থে বুদ্ধিবাদী লেখক বদরুদ্দীন উমর বিদ্যাসাগর সম্পর্কে ছিদ্রান্বেষণমূলক একটি গদ্য লিখেছিলেন, তারই জবাবে প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য উক্ত প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। এখানে তথ্যের পর তথ্য দিয়ে লেখক বোঝাতে পেরেছেন যে,— আরো নানা সামাজিক সমস্যার মতো কৃষকদের দুরবস্থা নিয়েও বিদ্যাসাগর যথেষ্ট ভেবেছেন। যদিও তিনি একথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আমাদের— 'সমস্ত মানবকে কি একই কাঁটায় ওজন করা যায়? ইতিহাসের ব্যক্তিবিশেষকে বিচারের আগে তো তাঁকে বোঝা চাই?'

এই প্রসঙ্গে পত্রলেখক হিসেবে আমি দু-একটি বিষয়ের অবতারণা করতে চাই। একজন ব্যক্তির 'স্বক্ষেত্র' কীভাবে নির্বাচন করব আমরা? আর কীভাবেই-বা আমরা সেই 'স্বক্ষেত্রে' তাঁর মূল্যায়ন করব?— যিনি কেবল শিল্পী, কবি, ধার্মিক, বিপ্লবী তাঁর স্বক্ষেত্র নির্ণয় করা যত সহজ; বিদ্যাসাগর, রামমোহন, গান্ধীজির মতো মহান ব্যক্তিত্বদের স্বক্ষেত্র কোনটা তার নির্ণয় কি ততটাই কঠিন হয়ে পড়ে না? বা এভাবে বলা যায়—

তাঁরা নিজেরাই নিজেদের জন্য এমন এক প্রসারিত ক্ষেত্র নির্মাণ করেছেন, নিজেদেরই ভাঙতে ভাঙতে— যা দেশকাল অতিক্রম করে এসেও আমাদের মতো অর্ধ-সচেতন বা অল্প-জানাদের কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। নাহলে প্রতিনিয়ত নানা কর্মকাণ্ডে আমৃত্যু জড়িয়ে থাকবার পরেও কেন আমরা প্রশ্ন তুলছি— কৃষকদের দুর্দশা নিয়ে বিদ্যাসাগর কতখানি চিন্তিত ছিলেন? কিংবা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে তিনি কি আদৌ ভাবিত ছিলেন? এমন প্রশ্নও তো উঠে পড়তে পারে যে— হিন্দু জাতি বা ধর্ম রক্ষায় তিনি কী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন?

আমরা আসলে লক্ষ করতে বলব— এমন সব প্রশ্নের নৈতিক বা ন্যায্যতার দিকটির প্রতি। এতে একজন মানুষের কাছে চাওয়ার মাত্রাটি কি বেহিসেবি হয়ে পড়ছে না? ফলে পুরো আলোচনা বা বিচার প্রক্রিয়াটিই অবান্তর হয়ে পড়ছে না কি? যে-দেশকালের যে যে পরিস্থিতির ওপর দাঁড়িয়ে তাঁরা কাজ করেছেন— তাকে বিস্মৃত হয়ে তাঁদের যেন এক কাল্পনিক সচ্ছল অবস্থায় রেখে বিচার করতে বসেছি আমরা! বিদ্যাসাগরের সমকালে আর আর শিক্ষিত ব্যক্তিরা কোন কোন দায়িত্ব কতদূর পালন করেছেন— তা মাথায় না রাখলে তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় বিদ্যাসাগরের কাজের পরিধি ও তাৎপর্য বোঝা সম্ভব হবে না; কতটা কঠিন ছিল তাঁর কাজ তাও উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হব। কেবল জমে উঠবে শুষ্ক তথ্যের পাহাড়।

আমরা এই সময়ে আমাদের প্রচলিত সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারি। কী ভয়ানক ফাঁকি আর চিন্তার আলস্যে সময়কে নির্মাণ করছি আমরা! মুখে ফুকো, দেরিদা, সার্ত্র আওড়াচ্ছি; বিজ্ঞানের দোহাই দিচ্ছি, আবার কথামৃতে-সুসমাচারে মঠে-মিশনে ডুবে আছি; একই মুখে রক্ষণশীলতা ও অতি-আধুনিকতার বুলি আউড়ে চলেছি। দুই নৌকায় পা রেখে দিব্যি সুখে-শান্তিতে বেঁচে আছি আর পেশাদারি শৌখিন যুক্তিবিলাসে বিচার করছি বিদ্যাসাগরকে। কিন্তু কোথায় সেই যৌক্তিক তেজ যা বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন থেকে লাভ করতে পারি! — যার সাহায্যে সমকালের অন্ধকারগুলোকে সরিয়ে ফেলতে সচেষ্ট হওয়া যায়!

এই প্রসঙ্গে চিন্তাশীল অমর্ত্য সেনের একটি

অসামান্য গ্রন্থের কথা মনে পড়ল— *নীতি ও ন্যায্যতা*। একটু উদ্ধৃতি দিই—

> 'যে পৃথিবী অতীত ও বর্তমানের বহু কুকর্মে তমসাবৃত, সেখানে যুক্তিপ্রয়োগের কাছে অনেক আশা এবং ভরসা থাকে। যখন আমরা কোনও কিছুতে খুব বিচলিত বোধ করি, তখনও সেই প্রতিক্রিয়াকে আমরা যুক্তি দিয়ে বিচার করতে পারি, প্রশ্ন করতে পারি প্রতিক্রিয়াটি যথাযথ কিনা এবং আমাদের তার দ্বারা চালিত হওয়া উচিত কিনা।'
>
> [যৌক্তিকতার পরিধি; *নীতি ও ন্যায্যতা*; আনন্দ পাবলিশার্স]

ঠিক এই যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি বিদ্যাসাগরকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করি তাহলে স্পষ্ট দেখতে পাব— তাঁর সামনে যেমন যেমন সামাজিক সমস্যা দেখেছেন, শিক্ষার সমস্যা অনুধাবন করেছেন— তিনি তেমন তেমন যুক্তিগত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন এবং সে বিষয়ে যতদূর সম্ভব লড়াই করেছেন। যদি তাঁর সামনে বর্তমানকালের রাজনৈতিক জটিল সমস্যা থাকত— আমরা নিশ্চিত যে এই সময়ের প্রেক্ষিতেও তিনি যথোপযুক্ত প্রতিক্রিয়া দেখাতেন— কোনোমতেই নির্বিবাদী শৌখিন যুক্তিচর্চা করে কালক্ষেপ করতেন না বা একইসঙ্গে কথামৃত, সুসমাচার, দেরিদা, সার্ত্রে বুঁদ হয়ে থাকতেন না; পথে নামতেন। আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হতেন কিন্তু কোনো সমস্যাকেই উপেক্ষা করতেন না। মঠ, মিশন বা কীর্তনের মায়াবী আশ্রয়ে ঠাঁই নিতেন না।

এই প্রতিক্রিয়া তা যতই যুক্তিনির্ভর হোক না কেন, তা যে বিপথেও চালিত হতে পারে— ইয়ংবেঙ্গলদের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে সম্যক বুঝতে পারব। ইউরোপীয় জ্ঞানচর্চা ও বয়সের আবেগে তাঁরা যে হঠকারি ধরনের কালাপাহাড়ি ভাঙাভাঙিতে নিয়োজিত হয়েছিলেন— তা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করেনি তো বটেই, নিজেরাই অনেকসময় পরিণত বয়সে পুনরায় সনাতন হিন্দু ধর্মের গহ্বরে ফিরে আসেন। বাকিদের ক্ষেত্রে অতখানি উলটপুরাণ না হলেও কার্যক্ষেত্রে তাঁরা বিদ্যাসাগরের সুদূরপ্রসারী কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদেরকে বেশ দূরেই সরিয়ে রেখেছিলেন; রামতনু লাহিড়ীর মতো কেউ কেউ অবশ্যই ব্যতিক্রম ছিলেন। বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই এই ধরনের শিকড়হীন কালাপাহাড়িতে বিশ্বাস করতেন না— পইতে ছুড়ে ফেলেননি, গোমাংস ভক্ষণ করেননি— অথচ পরিকল্পিত দৃঢ়তায় তাঁর স্বক্ষেত্রকে প্রসারিত ও সুদূরবিস্তৃত করে নিতে পেরেছিলেন সমাজের প্রতি গভীর আন্তরিক করুণায়। তাই তাঁর যুক্তিবোধ ও কর্ম সমাজ ও দেশকালকে স্থায়ী কল্যাণ এনে দিতে পেরেছিল।

অন্য একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করি: বিদ্যাসাগর যে স্তরের মনীষী ও সমাজসংস্কারক ছিলেন— সে তুলনায় সমগ্র ভারতে বা বিদেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েনি। কেন? হয়তো 'ধর্ম' তাঁকে খ্যাতি এনে দিতে পারত কিন্তু সেই 'ধর্ম' বিষয়ে তিনি ছিলেন নিরুৎসাহী আর তেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রও তখন প্রস্তুত ছিল না যার ওপর নির্ভর করে তিনি পাশ্চাত্যের আগ্রহ জাগিয়ে তুলবেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত 'ইউরোপে বিদ্যাসাগরের কথা' প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন:

> যিনি সাধারণের জন্য পুকুর কাটাইয়া দেন তাঁহার দাক্ষিণ্যের কথা একমাত্র গ্রামের লোকেই জানে। কিন্তু সুউচ্চ মন্দির নির্মাণ করিয়া দিলে নির্মাণকর্তার খ্যাতির যেন অন্ত থাকে না।... বহু শ্রমলব্ধ শাস্ত্রজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণে, তাঁহার সংস্কৃত কাব্যচর্চার শ্রেষ্ঠ ফল দেখি সরল সুন্দর বাংলা আখ্যানে। হিন্দু দর্শন মন্থন করিয়া তিনি বলিলেন সাংখ্য ও বেদান্ত ভ্রমাত্মক দর্শন,... বস্তুত বিদ্যাসাগরের সমস্ত কথা এবং সমস্ত কাজ বাঙালী জীবনের বোধোদয়। একথা বাঙালী যেমন বুঝিবে অন্যে তেমন বুঝিবে না। তাই বলিয়াছি, বিদ্যাসাগরের খ্যাতি বিদেশে পৌঁছাইবে না।

এই কথার পরে আর যুক্তি চলে না— তবু বলা যায়— সেকালের ইংরেজরা তাঁকে যথার্থ অর্থে চিনেছিলেন।

এই বিদ্যাসাগর যিনি অন্যের দুঃখকষ্ট দেখলেই কেঁদে ফেলতেন, এই দৃঢ়চেতা তেজি ইন্সপেক্টর যিনি ছাত্রদের অভিযোগ পেয়ে শ্রীমকে শিক্ষকপদ থেকে বরখাস্ত করেছিলেন— এই পণ্ডিত বিদ্যাসাগর যিনি মাত্র ১৯ বছর বয়সেই 'বিদ্যাসাগর' (১৮৩৯-এর এপ্রিল মাসে ঈশ্বরচন্দ্র ল কমিটির পরীক্ষায় পাশ করে যে সার্টিফিকেট পান— সেখানে লেখা ছিল— 'Iswarchandra *Vidyasagar* was found and declared to be qualified by his eminent

knowledge of the Hindu law to hold the Office of Hindoo Law Officer in any of the Established courts of Judicature.'— তথ্যসূত্র: টীকা-বারিদবরণ ঘোষ। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ; শিবনাথ শাস্ত্রী। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি.) উপাধি লাভ করেন— এই অভিমানী বিদ্যাসাগর যিনি সমাজের প্রতি অভিমানে জীবনের শেষ কয়েক বছর কার্মাটাঁড়ে কাটান;— এই মহান মানুষটিকে বিচার করবার সময় আমাদের একটি ন্যায্য নৈতিক দৃষ্টিকোণ ঠিক করতেই হবে। নাহলে কেবল যুক্তির বেড়াজালে আটকে পড়ব বা ছিদ্রান্বেষণে আগ্রহী হয়ে পড়ব। মনে রাখতে হবে তিনি বিজ্ঞানী ছিলেন না কিন্তু মহেন্দ্রলাল সরকারের পাশে তাঁকেই দাঁড়াতে হয়েছিল— Cultivation of Science প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। এই মায়াবাদে আচ্ছন্ন অলস সুবিধাবাদী দর্শনে বিশ্বাসী দেশে যে লড়াই ছিল রূপকথার মতো।

আসুন, বিদ্যাসাগরের জীবন থেকে আমরা এই শিক্ষা নিই— কীভাবে সুযুক্তি প্রয়োগ করে ও করুণার দ্বারা তমসাবৃত স্বকালকে পালটে দেওয়া যায়। আমাদের যাবতীয় জ্ঞান যেন 'অ' ও হয়, 'অ্যা'ও হয়-তে আটকে না পড়ে; ধর্মেও আছি, জিরাফেও আছি-র ভুলভুলাইয়ায় আটকে না পড়ে। মা সারদা, সার্ত্র বা রামকৃষ্ণ, বেঙ্কটরমন-এর মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তোলার মতো আহাম্মকি আর কতদিন চলবে? কুযুক্তি নয়, সুযুক্তি দিয়েই অন্ধকারকে ঘা দিতে হবে।

এই স্থবির সময়ে চিন্তা করতে প্রাণিত করার মতো চিন্তাশীল পত্রিকা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। *আরেক রকম* গত সাতবছর ধরে সেই বিরল দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

রণজিৎ অধিকারী
কলকাতা

২

আমার লেখার প্রত্যুত্তরে মালিনী ভট্টাচার্য যে চিঠি *আরেক রকম*-এর দপ্তরে পাঠিয়েছেন তা আমার গবেষণাকে সমৃদ্ধ করবে কোনো সন্দেহ নেই এবং এজন্য আমি ওনার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে বেশ কিছু ভুল ধারণার সূত্রপাত হয়েছে সে ব্যাপারে একটু আলোকপাত করতে চাই। প্রথমত আমি কখনোই শাসকদলের উৎসবপ্রীতিকে ধর্মনিরপেক্ষতার সার্টিফিকেট দিইনি, বরং এই উৎসবপ্রীতির মধ্যে লুকিয়ে থাকা ধর্মীয় এবং ধর্মনিরক্ষে দুই প্রকরণের কথাই উল্লেখ করেছি। ২০১৯ সালের ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ কনফ্লিক্ট অ্যান্ড ভায়োলেন্স-এ ধর্মীয় মেরুকরণের সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছি। এইভাবে ওই কয়েকটি পঙ্‌ক্তিকে তুলে ধরে লেখককে পক্ষপাতদুষ্ট বলাটা গ্রহণযোগ্য নয় কোনোভাবেই।

এবারে আসি মূল প্রসঙ্গে। যে দু-প্রকার ভ্রান্তির কথা আমি আমার ফিল্ড নির্ভর গবেষণা থেকে তুলে ধরেছি তা পশ্চিমবঙ্গের কিছু মৌলিক রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা ও তত্ত্বায়িত করতে পারে যা এর আগের প্রায় কোনো গবেষণাতেই দেখিনি। আগের প্রায় সমস্ত গবেষণাতেই কাঠামোগত তত্ত্বের প্রভাব চোখে পড়ার মতো এবং তা নিয়ে খুব একটা সমালোচনাও চোখে পড়েনি।

পার্টি যে সাধারণ মানুষের পাশে থেকেছে তা আলাদা করে উল্লেখ করা নেই, থাকার কথাও নয় কারণ কাজের পরিধি সম্পর্কে শুরুতেই বলা রয়েছে ২০০৮-২০১৫ যে সময় অন্তত আমার চেনা অঞ্চলে পার্টি সাধারণ মানুষের পাশে থেকে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছে এমনটা দেখা যায়নি, বরং পার্টি সর্বময় কর্তা হয়ে উঠেছে সে চিত্রই ফুটে উঠেছে বার বার। বামপন্থী আন্দোলন এবং তার গুরুত অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই, কিন্তু ওই সময়কালে সেসব অতীত হয়েছে। শ্রেণি সংগ্রামের আন্দোলনের জন্য যে প্রস্তুতি প্রয়োজন ছিল তা বামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গে সমসাময়িক সময়ে অন্তত সংগঠিত করতে পারেননি এবং সেজন্যই লালগড়ের আন্দোলন কিছু ক্ষুদ্র এবং সংকীর্ণ (?) বিষয়েই সন্নিবদ্ধ ছিল।

আমার এই তত্ত্বায়ন স্বয়ংসম্পূর্ণ একথা কখনোই বলা যাবে না এবং মালিনী ভটাচার্যের উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়ই গ্রামবাংলায় ঘটে চলেছে বহুদিন থেকে। গায়ের জোর খাটানো, খতমের রাজনীতি, রক্তাক্ত লড়াই এসবই নিত্তনৈমিত্তিক ঘটনা এবং বেশিরভাগ ঘটনাই খবরে আসে না। প্রত্যেকটি বিষয় আলাদা গবেষণার দাবি রাখে সন্দেহ নেই, কিন্তু সংস্কৃতির স্তরে কিছু মৌলিক পরিবর্তন যে বিগত কয়েক বছরে ঘটেছে সেকথা অস্বীকার করা যায় না।

একথা ঠিক এই লেখায় ভায়োলেন্সের কথা সেভাবে উল্লেখ নেই, থাকা উচিত ছিল। ভবিষ্যতে আমি একথা অবশ্যই মাথায় রাখব, কারণ আমার মূল কাজে এই

বিষয়ে বিস্তারিত বলা আছে, এখানে বলা থাকলে পরিবর্তনের ধরন সম্পর্কে খানিকটা বলা যেত।

পরিশেষে ঠিক কী কারণে হঠাৎ ২০১১ সালেই মানুষের মধ্যে পরিবর্তনের ইচ্ছে জাগল এই বিষয়ে থিসিস হতে পারে, একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধে তা বলা সম্ভবও নয় সমীচীনও নয়। তবে প্রশাসনিক ব্যর্থতা, অন্তর্ঘাত, দলীয় কোন্দল, মিডিয়ার ব্যবহার ইত্যাদি বহুশ্রুত বিষয় অবশ্যই নিবিড় গবেষণার দাবি রাখে, কিন্তু আমার এই কাজের পরিধির মধ্যে আসে না।

সুমন নাথ
কলকাতা

৩

বড়ো কবি লেখকরা আমাদের কখনো ছেড়ে যান না। নানাভাবে আমাদের জীবনে এবং কর্মক্ষেত্রের বিবিধ পরিসরে তাঁরা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। যাঁরা সাহিত্য নিয়ে কারবার করেন তাঁরা শুধু যে জীবন নিয়ে নানান দৃষ্টিপাত করেন তাই নয়, তাঁরা অনেকেই প্রত্যক্ষ বা না হলেও পরোক্ষভাবে ভাষার শরীর ও তার ক্রম-বিবর্তন নিয়ে কাজ করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে শৈশব থেকে যৌবনে পৌঁছে দিয়েছিলেন। একইরকমভাবে তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের অন্তত তিন কবি যাঁরা এই বিষয়ে গভীর মনোনিবেশ করেছেন তাঁরা হলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শঙ্খ ঘোষ। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কাব্যরীতিতে মুখের ভাষাকে ব্যবহার করেছিলেন। শুধু ব্যবহার করেছিলেন এমনটা না, তাকে একটা মান্য চরিত্রে পৌঁছে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন। কবিতার পাশাপাশি শুধু ভাষা নিয়েও বেশ কয়েকটি বই তিনি রচনা করেছেন এবং সে রচনা গুরুগম্ভীর নয়, স্বাদু। সেখানে যথেষ্ট ভাবনার রসদ আছে। এ পর্যায়ে বর্তমান ১-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সংখ্যায় পলাশবরণ পাল ‘অক্ষরে অক্ষরে’ ও ‘কাজের বাংলা’ দুটি বই নিয়ে আলোচনা করেছেন। ‘কাজের বাংলা’ বইটি প্রকাশের আগে ধারাবাহিকভাবে ‘কর্মক্ষেত্র’ পত্রিকায় রচনাগুলো প্রকাশিত হয়েছিল। পলাশবাবু যথার্থই বলেছেন— ‘এইজন্যই বলে, বাঙালি শিশু বিশেষভাবে সৌভাগ্যবান। সবচেয়ে বড়ো বড়ো সাহিত্যিকরাও তাদের জন্য লেখেন কবিতা বা ছড়া বা গল্প। এমনকী, সবচেয়ে বড়ো কবিরাও তাদের জন্য লেখেন ভাষাশিক্ষার বই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন। ধন্যবাদ পলাশবাবুকে। আপনার এই রচনায় সুভাষ আলোচনায় নতুন স্বর যুক্ত হল।

গৌতম সাহা
কাটোয়া

পুনঃপাঠ

আমার মৃত্যুর পর

অশোক মিত্র

বছর কয়েক আগে একটি স্মৃতিকথা লিখতে সাহসী হয়েছিলাম, বিচ্ছিন্ন নানা ঘটনার অর্ধ-কিংবা অসম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, সেই সঙ্গে যে-মানুষজনের সঙ্গে দশকের পর দশক ধরে পরিচয়-সখ্য-সংঘর্ষ, তাদের সঙ্গে আদান-প্রদানের আখ্যানের সমষ্টি সেই স্মৃতিগ্রন্থ: 'আপিলা চাপিলা'। স্মৃতিকথাটির একেবারে শেষ পঙ্ক্তি: '... এই অকিঞ্চিৎকর জীবনে দুটি আলাদা চরিতার্থতাবোধ: এক, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমার জন্ম; দুই, আমার চেতনা জুড়ে মার্কসীয় প্রজ্ঞার প্লাবিত বিভাস।'

এখানেই সমস্যায় আক্রান্ত হতে হয়। বিভিন্ন প্রাঙ্গণ থেকে কৌতূহলী প্রশ্ন, অবিশ্বাসজনিত প্রশ্ন, চিমটি-কাটা প্রশ্ন: কী করে মেলাই আমি, কী করে মেলানো সম্ভব, যে-দুই প্রজ্ঞার প্রসঙ্গ আমি উল্লেখ করেছি, তাদের? নিজেকে মার্কসবাদী বলে গর্বিত প্রচার করি, মার্কসীয় বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সমাজের জিজ্ঞাসা-বিবর্তন বিশ্লেষণে নিমগ্ন হই, মার্কসীয় ধ্যানধারণার প্রেক্ষিতে অর্থশাস্ত্রের গহনে শ্রেণিদ্বন্দ্বের অন্বেষণ করি। অথচ সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমার অভিভূত গরিমাবোধ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জন্মগ্রহণ করেছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করি, তাঁর কবিতায় গানে প্রতিনিয়ত অবগাহিত হয়ে অধরার সন্ধান পাই, আমার চেতনা জুড়ে, মার্কসের পাশাপাশি, সব সময়ই রবীন্দ্রনাথের আনন্দনিষ্যন্দিত উপস্থিতি।

না, এই আপাতহেঁয়ালি নিয়ে আমার মনে আদৌ কোনো দ্বিধানুভূতির যন্ত্রণা নেই। কী করে এটা অস্বীকার করি, রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাষা দিয়েছেন। আজ থেকে ছশো-সাতশো বছর আগে বাংলা একটি প্রায় নিরেট কোনোক্রমে-খুঁড়িয়ে-চলা ভাষা। দেবভাষা সংস্কৃত ভেঙে পালি, পালির অপভ্রংশ হিশেবে বাংলা ভাষার উন্মেষ-উন্মোচন। সেই সময়কালে আমাদের মাতৃভাষা যথার্থই অতি শাদামাটা অবস্থায়, শাদামাটা মানুষের চিন্তাপ্রকাশের চিন্তা-বিনিময়ের ভাষা, সেই ভাষার তরণী বেয়ে সংস্কৃতির-জ্ঞানের-চিন্তার উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে পৌঁছনো সত্যিই অসম্ভব ছিল। বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার দত্ত-মদনমোহন তর্কালংকার-বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা আমি অস্বীকার করছি না। তা হলেও যে বাংলা আধুনিক পৃথিবীতে অন্যতম সুচারুতম সুঠামতম মধুরতম ভাষা বলে বন্দিত, তা প্রায় পুরোপুরি রবীন্দ্রনাথের দান। মাত্র পঁয়ষট্টি-সত্তর বছরের পরিচিকীর্ষায় তিনি বাংলা ভাষার আদল খোলনল্চে পালটে দিলেন। আধুনিক থেকে আধুনিকতর, আধুনিকতর থেকে আধুনিকতম, একটি সৌষ্ঠবে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে বাংলা ভাষা পৌঁছে গেল, এবং পৌঁছে গেল— ঠ্যাটা উক্তি করছি না— একান্ত রবীন্দ্রনাথের প্রয়াসে। বাংলা ভাষার মধ্যবর্তিতায় এখন যে আমরা দুরূহতম দর্শন বা বিজ্ঞান চর্চায় নিজেদের নিযুক্ত করতে পারি, কিংবা মহত্তম গুণবর্তী সাহিত্যসৃষ্টির তপস্যায় ব্রতী হতে পারি, সাফল্যের অভাবনীয় শিখরচূড়ায় উত্তীর্ণ হতে পারি, রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাষাকে তৈরি করে গিয়েছেন বলেই। আমরা হাসি, কাঁদি, গল্পগুজব করি, কেচ্ছা ছড়াই, গানে-গুনগুনিয়ে উঠি, কলহে প্রবৃত্ত হই, সব-কিছুরই প্রকাশের পথ বাতলে দেয় রবীন্দ্রনাথ দ্বারা নির্মিত-চর্চিত, রূপমণ্ডিত বাংলা ভাষা। ভাষার দার্ঢ্য এবং, সেই সঙ্গে বিস্তার না থাকলে চিন্তা এলিয়ে পড়ে, যুক্তির সারণি বেপথুমান হয়, ভাবনাকে সংহত রূপ দিতে আমরা অসমর্থ হই। রবীন্দ্রনাথ-দত্ত ভাষার ভেলায় ভেসেই আমরা প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞানের স্তরের পর স্তর অতিক্রম করতে সমর্থ হই। হাটে-মাঠে-ঘাটে যখন মার্কসবাদী হিশেবে নিজের বিশ্বাসের কথা অন্যদের শোনাতে যাই, তখনো তো আমার প্রধান অবলম্বন আমার মাতৃভাষা, যা রবীন্দ্রনাথের ভাষা, রবীন্দ্রনাথ যা ভূষণে-রতনে আমাদের জন্য রচনা করে গিয়েছেন, অথচ ভূষণরত্নের ভারে প্রসাদগুণ বিমূঢ় হয়নি।

আমার মনে তাই কোনো জড়তা নেই, আত্মসংকটের প্রশ্ন ওঠে না। আমি মার্কসবাদী, সেই সঙ্গে আমি রবীন্দ্রনাথে সমাচ্ছন্ন: এই যুগ্ম গর্বভাষণেই আমার সত্তা অহংকারে উচ্ছল। শৈশব থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়-গানে তাঁর গল্পে-প্রবন্ধে ডুবে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে বলেই ক্রমশ আমার চেতনার বিকাশ ঘটেছে, আমি পৃথিবীকে বুঝতে শিখেছি, সমাজকে তার

বিবিধ অসামঞ্জস্য-পাপাচার সমেত, জানতে পেরেছি, এবং সে-সব সম্ভব হয়েছে রবীন্দ্রনাথ সহায়ক ভাষা তৈরি করে দিয়েছিলেন বলেই, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের গতি নেই, বাঙালি হিশেবে এই সপ্রেম কাতরোক্তি করতে গিয়ে আমার মার্কসীয় বিশ্বাসে এতটুকু চিড় ধরে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় চিন্তায় আকুল-ব্যাকুল হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম বলেই তো আমি মার্কসবাদী হতে পেরেছি। একদা অনেক প্রগল্‌ভ বালখিল্য তর্ক-বিতর্কের আয়োজন হয়েছিল: রবীন্দ্রনাথ জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি সামন্তপন্থী, পদ্মার তীরে হাউসবোটে দিনযাপন করে প্রজাদের উপর খবরদারি করতেন, তাদের কাছ থেকে নির্মম ঔদাসীন্যে খাজনা আদায় করতেন, পরবর্তী জীবনে জমিদারি পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ছেলেকে যখন উত্তরবঙ্গে পাঠিয়েছিলেন, কলকাতা থেকে প্রতি চিঠিতে বিশদ উপদেশ ফিরি করতেন, যাতে প্রজাকুলের কাছ থেকে প্রাপ্য নিষ্কাশনে বিগলিত করুণাবশত কোনো ব্যত্যয় না ঘটে, ইত্যাদি নিয়ে মস্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধ ফাঁদা হয়েছিল।

সামগ্রিক বিচারে এ-সমস্ত এলেবেলে প্রসঙ্গই উৎক্ষিপ্ত। কোন শ্রেণিতে জন্মগ্রহণ করেছি তার জন্য আমরা কেউই দায়ী নই। সেই শ্রেণিভুক্তিহেতু কিছু-কিছু দায়ভার, ইচ্ছা বা পছন্দ করি না করি, আমাদের বহন করতে হয়। কিন্তু জীবমণ্ডলের অন্য সদস্যদের থেকে এখানেই মানুষ হিশেবে আমাদের পার্থক্য, আমাদের আদি সংস্থান থেকে আমরা ছাড়িয়ে যেতে পারি, বেরিয়ে যেতে পারি। আমরা পেরিয়ে যাই, এগিয়ে যাই, ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে অতল জলের আহ্বান শুনতে পাই, নিজেদের চেতনা ও সত্তাকে অহরহ শাণিততর, সংস্কৃততর করতে শিখি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ কোন শ্রেণিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কী বিশেষ পরিমণ্ডলে আবদ্ধ থাকতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন, কিংবা হয়তো-বা পছন্দ করেছিলেন, সে-সব কিছুর চেয়ে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক পৃথিবীকে, মনুষ্যসমাজকে, জাতিকে, দেশকে, তিনি কী দিয়ে গেছেন। তা ছাড়া, এটাও বা কী করে ভুলে থাকি, যে যিনি অনুপ্রাস অথবা মিলের তাড়নায় লিখেছিলেন ‘গঞ্জের জমিদার সঞ্জয় সেন দু’মুঠো অন্ন তাকে দুই বেলা দেন’, তিনিই আড়াই-কুড়ি বছর আগে রচনা করেছিলেন ‘দুই বিঘা জমি’। কী করে বা এটাও ভুলি, ভূস্বামী রবীন্দ্রনাথই জীবনের শেষ প্রান্তে প্রজ্ঞালব্ধ অমর্ত্যভূমিতে দাঁড়িয়ে, যারা কাজ করে তাদের জন্য অভিনন্দন বাণী প্রেরণ করেছিলেন, বিপ্লবের জন্য যারা প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে, তাদের উদ্দীপ্ত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আয়ুর অন্তিম লগ্নে, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে এলেও, তাঁর অন্তিম বিশ্বাসে এতটুকু দোদুল্যমানতা ছিল না, তাঁর রচিত শেষতম সংগীত, ‘ওই মহামানব আসে’।

প্রসঙ্গান্তরে যাই। তবে এই প্রসঙ্গ পরিবর্তনও আমার চেতনা জুড়ে রবীন্দ্রনাথের যে-সর্বসমাচ্ছন্নকারী উপস্থিতি, তাকে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার্ঘ্য সম্ভাষণ জ্ঞাপনের লক্ষ্যেই। যে-বয়সে পৌঁছেছি, মৃত্যুচিন্তা এড়ানো অসম্ভব, এবং সেজন্যই ইচ্ছাপত্র গোছের কিছু বাসনার কথা ব্যক্ত করছি।

ধরে নিচ্ছি আমার মৃত্যুকালে তখনো কয়েকজন বন্ধু অবশিষ্ট থাকবেন। উদ্ধত সাহসের সঙ্গে আরো ধরে নিচ্ছি, তাঁরা হয়তো আমার জন্য একটি ক্ষুদ্রায়তন স্মরণসভার আয়োজন করবেন। সেই সভায়, আমার বিনীত অনুরোধ, স্মৃতিচারণ ধাঁচের বক্তৃতাদি একেবারে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কিছু গান, একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই কিছু গান, যেন গাওয়া হয়। সভার যাঁরা আয়োজক, তাঁদের কাছে আগাম একটি আবদার-মেশানো আবেদন পেশ করে যাচ্ছি।

যদি ধরে নিই বিভিন্ন গায়ক-গায়িকা সব মিলিয়ে মাত্র পঁচিশটি গান গাইবার সুযোগ পাবেন, তার বেশি সময় পাওয়া যাবে না, আমি চাইবো যে-তালিকা উপস্থাপন করছি, সেই অনুযায়ী গানগুলি অনুগ্রহ করে যেন বাছা হয়। রবীন্দ্রনাথ আড়াই হাজারেরও বেশি গান লিখে গেছেন, তাদের মধ্য থেকে মাত্র পঁচিশটি নির্বাচন করে তাদের শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করা বিশুদ্ধ পাগলামো। যে-গানগুলি নীচের তালিকাভুক্ত করছি সেগুলি রবীন্দ্রনাথ-রচিত শ্রেষ্ঠতম পঁচিশটি গান কি না আমি জানি না কিন্তু তারা আমার প্রিয়তম। এটুকু ভাবা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না, আমার স্মরণসভায় আমার প্রিয় গানগুলিই গাওয়া হবে। এই বিশেষ ক’টি গানের সঙ্গে হয়তো কিছু স্মৃতি আলোড়ন, কোনো সান্নিধ্যের স্নিগ্ধ স্মৃতি, কোনো বিষণ্ণ অভিজ্ঞতার নীলাঞ্জন ছায়া লব্ধ অথবা কোনো আনন্দের ফিকে চেয়ে যাওয়া দ্যোতনা।

১. অশ্রুভরা বেদনা
২. আকাশভরা সূর্যতারা
৩. আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে
৪. আজি ঝড়ের রাতে
৫. আজি বিজন ঘরে নিশীথরাতে
৬. আমার নিশীথরাতের বাদল ধারা
৭. আমি তখন ছিলেম মগন
৮. এ পরবাসে রবে কে হায়
৯. এক দিন চিনে নেবে তারে
১০. একদা তুমি প্রিয়ে
১১. এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে
১২. ওরে বকুল পারুল, ওরে শালপিয়ালের বন
১৩. কখন দিলে পরায়ে
১৪. কে দিল আবার আঘাত
১৫. ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে শুনি

১৬. খোলো খোলো দ্বার
১৭. জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে
১৮. তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম
১৯. দাঁড়াও আমার আঁখির আগে
২০. ধীরে ধীরে ধীরে বও ওগো উতল হাওয়া
২১. নিবিড় অমা তিমির হতে
২২. মেঘ বলেছে যাব যাব
২৩. যখন এসেছিলে অন্ধকারে
২৪. যে রাতে মোর দুয়ারগুলি
২৫. স্বপ্নে আমার মনে হল

তবে অতি সাধারণ মানুষ আমি, তাই আমারও লোভের শেষ নেই। কল্পনা করতে সাহস পাই, কে জানে, আমার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় একটি স্মরণ সভারও উদ্যোগ গ্রহণ করবেন অন্য কয়েকজন সুহৃদ, এবং সেই সভাতেও হয়তো রবীন্দ্রনাথের পঁচিশটি গান গাওয়া বরাদ্দ থাকবে। সেই গানগুলির তালিকাও আমি মনে-মনে স্থির করে রেখেছি:

২৬. অনেক কথা যাও যে বলে
২৭. আকাশ আমায় ভরল আলোয়
২৮. আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে
২৯. আঁধার রাতে একলা পাগল
৩০. আমার যাবার বেলায়
৩১. আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ
৩২. আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া
৩৩. এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে
৩৪. ও চাঁদ, চোখের জলের
৩৫. কী বেদনা মোর জানো
৩৬. কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ
৩৭. ক্ষমিতে পারিলাম না যে
৩৮. তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
৩৯. তুমি কিছু দিয়ে যাও
৪০. তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে
৪১. দখিন হাওয়া জাগো জাগো
৪২. দীপ নিভে গেছে মম
৪৩. বঁধু কোন আলো লাগল চোখে
৪৪. বিরস দিন বিরল কাজ
৪৫. ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায়
৪৬. মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ
৪৭. রাঙিয়ে দিয়ে যাও
৪৮. রোদন ভরা এ বসন্ত
৪৯. সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে
৫০. সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে

তবে মোটরগাড়ির ক্ষেত্রে যে-আওয়াজ, একটি বাড়তি চাকা গাড়ির পিছনে বন্দী থাকে; রাস্তায় যদি কোনো একটি চাকা ফেঁসে যায়, বাড়তি চাকাটি খুলে নিয়ে জুড়ে গাড়িকে ফের সচল করা হয়। দুই স্মরণসভার জন্য রবীন্দ্রনাথের পঁচিশটি গানের আলাদা দুই তালিকা তৈরি করার পর আরো দশটি গানের কথা আমি ভেবে রেখেছি। যদি অবধারিত কারণবশত ওই পঞ্চাশটি গানের একটি-দুটি গাওয়ার মতো গায়ক কিংবা গায়িকাকে হাতের নাগালে পাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে বন্ধুদের কাছে অনুরোধ নীচে, উল্লেখিত দশটি গান থেকে বেছে নিয়ে দয়া করে শূন্যস্থান পূরণ করে নেবেন তাঁরা:

৫১. আগুনের পরশমণি
৫২. আজ জ্যোৎস্নারাতে
৫৩. আনন্দধারা বহিছে ভুবনে
৫৪. আমার মল্লিকাবনে
৫৫. আমি চঞ্চল হে
৫৬. এনেছ ওই শিরীষ বকুল
৫৭. তবু মনে রেখো
৫৮. বসন্তে ফুল গাঁথল
৫৯. মধু-গন্ধে ভরা
৬০. শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে

(বানান অপরিবর্তিত)

অশোক মিত্রের এই প্রবন্ধটি তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্র বলে ভাবা যেতে পারে। তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী মনে রেখে আমরা এটি পুনর্মুদ্রিত করলাম।

LIFE BEGINS AT 60!

JAGRITI DHAM

KOLKATA'S MOST COMPREHENSIVE HOME FOR SENIOR LIVING

SAFETY · ACTIVITY · COMMUNITY · SPIRITUALITY

Yoga & meditation

Wellness spa

Indoor games

Privilege access to IBIZA Club

24 x 7 Medical care

Mandir

ROOMS

- Furnished and fully-serviced AC rooms
- TV, balcony, attached toilet and pantry
- Housekeeping and maintenance on call
- Wi-fi, Intercom

SENIOR-FRIENDLY ARCHITECTURE

- Wheel chair and walker-enabled spaces and ramps
- Spacious lifts to accommodate stretchers
- Specially designed bathrooms with wheel chair-accessible showers

SECURITY

- 24 hours manned gate with intercom
- Electronic surveillance, CCTV
- Power back-up

HEALTHCARE

- 24 x 7 ambulance, attendant, emergency healthcare
- Visiting doctors, specialists-on-call
- Emergency button in every room and frequently occupied areas
- Tie-ups with the city's best nursing homes and hospitals

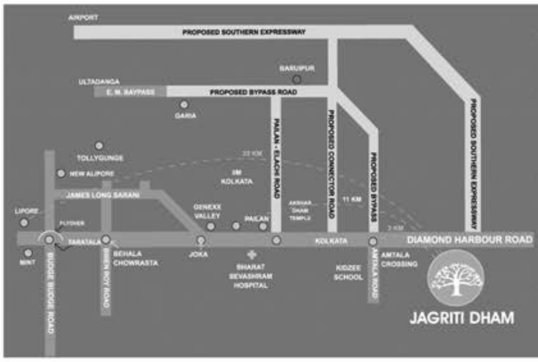

- Inside Merlin Greens complex
- Adjacent to Ibiza on Diamond Harbour Road
- Near Bharat Sevasram Hospital and Swaminarayan Dham Temple
- 5 kms from Nature Cure and Yoga Research Institute

+91 88 200 22022 | Merlin Greens, IBIZA Club, Diamond Harbour Road, Pin 743 503
contact@jagritidham.com | www.jagritidham.com

Issue date 1 May 2019. Registered No. KOL RMS/455/2019-2021
Registered with the RNI NO. WBBEN/2013/49896.
Vol. 7, Issue 9 Arek Rakam

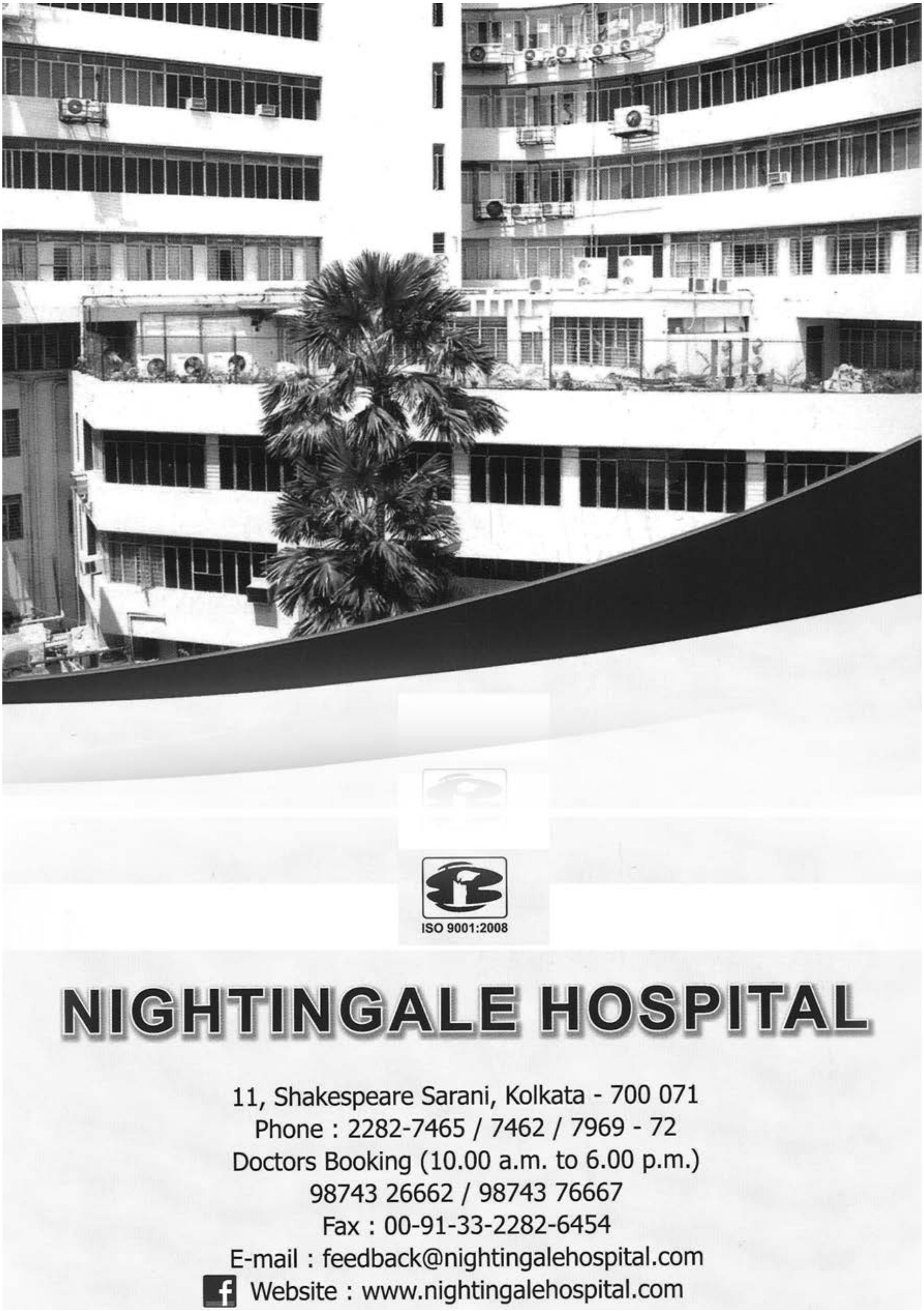

Published by Trishitananda Roy on behalf of Samaj Charcha Trust from 3rd Floor, 39A/1A, Bosepukur Road, Kolkata–700 042 and printed by him at S. P. Communications Pvt. Ltd., 31B Raja Dinendra Street, Kolkata–700 009.